Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা.সিনথিয়া আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৫২

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা.সিনথিয়া আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৫২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা.সিনথিয়া আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৫২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sinthia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছা.সিনথিয়া আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৫২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 7

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিচিতি : 8

তার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস : 8

হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু এর কানে আজান : 10

মাথা মুন্ডন: 10

আকিকা: 11

খতনা: 11

ভাই বোন : 11

মামা ও খালা : 12

খিলাফতের দুর্যোগ কাল : 12

ইয়াজিদের নামে বাইয়াত : 13

মুয়াবিয়া (র) এর মদীনায় সফর: 14

মুয়াবিয়া (রা) এর মক্কা - সফর: 15

মুয়াবিয়ার আলীকে সঠিক পরামর্শ : 16

মুয়াবিয়া (রা) এর চিরবিদয় ও অসিয়ত: 17

ওয়ালিদের কাছে ইয়াজিদের চিঠি: 18

দুজনের মক্কা যাত্রা : 20

যে সব কারণে তিনি কুফা অভিমুখে রওনা হলেন: 21

হুসাইনকে কুফাবাসীদের চিঠি: 21

মুসলিম ইবনে আকিলে চিঠি : 22

পাল্টে গেল পরিস্থিতি : 23

কুফার ক্ষমতার পরিবর্তন : 24

ইবনু যিয়াদ কুফায় গমন : 25

ইবনু যিয়াদের প্রথম ভাষণ :.....26
ওবায়দুল্লাহ যিয়াদের পদক্ষেপ :.....27
হানি বিন ওরওয়াকে গ্রেফতার :.....28
ইবনে যিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও :.....30
মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা :.....32
হানি বিন ওরওয়াকে হত্যা :.....35
কুফায় যাবেন হুসাইন:.....35
আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের পরামর্শ :.....37
আবু সাঈদ ক্ষুদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ :.....38
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর পরামর্শ :.....38
আব্দুল ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ :.....38
ওমরা বিনতে আব্দুর রহমানের পরামর্শ:.....39
আব্দুল্লাহ বিন মুতি পরামর্শ:.....39
প্রখ্যাত কবি ফারাযদাকের পরামর্শ:.....40
মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহর পরামর্শ:.....40
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ :.....41
ইয়াজিদের চিঠি :.....42
কোফার পথে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসলিমের হত্যা সম্পর্ক অবগতি :.....43
ইবনে যিয়াদের প্রতি রক্ষা কৌশল:.....45
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু করতে তার সঙ্গীদের মাঝে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা :.....46
হুর বিন ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ :.....47
ওমর ইবনে সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ :.....48
কারবালার যুদ্ধ ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত :.....51
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মদিনা প্রত্যাবর্তন :.....53

হুসাইন এর হত্যাকারীদের পরিণতি :.....55
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ভবিষ্যৎ বাণী :.....56
হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহে শাহাদাতের মূল লক্ষ্য :.....56
উপসংহার:.....57

ভূমিকা:

একদল সাহাবীকে নিয়ে নবী কারীম সাঃ একদিন মদিনার গলিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল কোন একজন সাহাবীর বাড়িতে দাওয়াত। সে পথে খেলছে একজন বালক, যাকে দেখে নবীজির চেহারায় খুশির আবার ছড়িয়ে পড়ে, হাসিমুখে তিনি তার দিকে এগিয়ে যান। নবীজিকে দেখে ভালো একটি খুশী তো উচ্ছল হয়ে ওঠে। নবীজি তাকে ধরতে চাইছে কিন্তু তিনি তার কাছে ধরা দেবেন না এমন ভান করে দূরে যেতে চাইছে।ব্যাপারটি বুঝতে পেরে নবীজি তাকে দুই হাত মেলে তাকে ধরেন। নবীজি হাসতে হাসতে তাকে ধরে ফেলেন, কোমল মমতায় জড়িয়ে নেন বুকের সাথে। বালকটি ও নিজেকে সঁপে দেই নবীজির কোলে।নবীজি তার চোয়াল ধরেন আরেক হাতে তার মাথার তালুতে রেখে স্নেহে চুমু দেন তাকে।সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, হুসাইন আমার আমি হুসাইনের।হুসাইন আমার অতি আদরের নাতি।

হ্যাঁ, সেই বালকটি হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নয়নমণি,কলিজার টুকরা, জান্নাতি যুবকদের নেতা। তার প্রতি ভালোবাসা রাখা মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু এই হুসাইনকে নবাবী আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে মুসলিম নামধারী একদল পাপিষ্ঠদের হাতে- চোখের সামনে আপন পরিবারের নির্মমৃত্যু দেখে, ও দূরে ফুরাতের কুলকুল জলধারা থাকার পরও ছাতি ফাটা তৃষ্ণা নিয়ে, জন্মভূমি থেকে বহু দূরে কারবালা প্রান্তরে।

কারবালার ঘটনা মুসলিম জাতির ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। এটা কোন সাধারণ হত্যাকান্ড বা আত্মত্যাগের আখ্যান নয়। এর বাস্তবতা এত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক যা পৃথিবী সমস্ত নৃসংসতা ও পাশবিকতাকে হার মানায়। ফলে হাজার বছর পেরিয়ে গেল এ ঘটনা মুসলিমদের হৃদয়ে বেদনার রক্তক্ষরণ ঘটায়।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিচিতি :

পূর্ণনাম :হোসেন বিন আলি বিন বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আব্দুল কুরাইশী মাদানী শহীদ।(সিয়ারু আ'লামিন নুবাল:৩/২৪৬)

তিঁনি ছিলেন নবী কারীম সাঃ এর দৈহিত্র এবং জান্নাতের যুবকদের অগ্রনেতা। প্রসেস সাঃ এর মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর গর্ভে তিঁনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা আমিরুল মুমিনিন আলী বিন আবি তালিব। তিঁনি উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নাতি।

তার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস :

১.আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান হোসেনকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো। আর যে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করল। (সুনানে নাসায়ী:৮১৬৮)

২.আলী রাদিয়াল্লাহু বলেন, একদা রাসূল হাসান হোসেনের হাত ধরে বললেন, যে আমাকে এবং এ দুজনকে ভালোবাসলো এবং বাবাকে ভালোবাসলো সে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গী হবে। (মুসনাদে আহমদ:১/৭৭,সুনানে তিরমিজি -৩৭৩)

৩.আবু জুবায়ের, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের কাছে গিয়ে দেখি তিনি হাত ও হাঁটু দিয়ে জমিনের উপর ভোর দিয়ে আছেন। আর হাসান হোসাইন তার পিঠের উপরে উঠে খেলছে। আর মেঝেতে ঘুরাঘুরি করছেন আর বলছেন কত উত্তম বাহন তোমরা পেয়েছ আর কত উত্তম আরোহী আমি পেয়েছি! (আশ শারীয়াহ লিন আজুরবী-৫২১৬০)

৪.আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিঁনি বলেন একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সালামের সাথে নামাজ পড়ছিলাম, রাসূল যখন সেজদায় গেলেন এমন সময় হাসান- হুসাইন রাসূল (স.) এর পিঠে উঠে গেল, রাসূল সাঃ সেজদা থেকে ওঠার সময় কোমলভাবে তাদেরকে নামিয়ে দিলেন। আবার যখন সেজদায় গেলেন তারা আবারো পিঠে উঠে গেল আর এভাবেই তিঁনি নামাজ শেষ করলেন। (আশ শারীআহ-৫/২১৬১)

৫.ইমনে বুরায়দা স্বীয় বাবা হতে বর্ণনা করতো, বলেন একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম মেম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় হাসান হুসাইন মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁদের গায়ে ছিল সুন্দর লাল জামা তাঁরা দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, তা দেখে রাসুল সাঃ মেম্বার থেকে নেমে পড়লেন এবং তাঁদের তুলে নিলেন। এরপর বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য বলেছেন,নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা।আমি যখন আমার আদরের এ দুই সন্তানকে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতে দেখলাম,আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না তাদের দিকে ছুটে গেলাম। (তাগাবুন,আয়াত:১৫,আশ শরীয়াহ-৫/২১৬২)

৬.অনেকদিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, যখন হুসাইনের মাথা ওবায়দুল্লাহ বিন জিহাদের সামনে আনা হয় এবং একটি প্লেটে রাখা হয়, তখন ওবায়দুল্লাহ তার চেহারায় খোঁচা দিতে লাগলো এবং তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগলো।তখন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু তার এমন একটি আচরণ দেখে বলে উঠলেন, হোসেনের চেহারা রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের চেহারার সাথে সব থেকে বেশি মিল ছিলো।তাঁর চুলের নীল রঙের খেজাব ছিলো।(বুখারী -৩৭৪৭)

৭.ইয়ালা আল আমরি রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি একদিন রাসূল সাঃ এর সাথে দাওয়াত খেতে বের হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম তাকে নিয়ে মেজবানি বাড়িতে গেলেন। নবীজি সেখানে হোসেনকে দেখেন ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলছে। রাসূল তাকে ধরার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু সে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। রাসূল সাঃ হেসে দিলেন, হাসতে হাসতে তাকে এক পর্যায়ে ধরে ফেললেন। এরপর কোমর ভাবে একটি হাত তার কাঁধে রাখলেন এবং এক হাত কি বুকে নিচে রাখলেন। তারপর আবেগ ধরে তাকে চুমু খেলেন আর বলেন হুসাইনন আমার আমি

হুসাইনের।হে আল্লাহ যে হুসাইনকে ভালোবাসে আপনিও তাকে ভালবাসেন, হুসাইন তো শুভপ্রদ মহাপ্রাণ সম্প্রদায়ের অগ্রণী নেতা।(ফাজায়েলে সাহাবা -পৃ:১৩৬১)

জন্ম ও নামকরণ: বিশুদ্ধ মতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসের জন্মগ্রহণ করেন তবে এক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন অভিমত রয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু বলেন,যখন হাসানের জন্ম হয় নবী সঃ এসে বললেন আমার নাতিকে বলে দাও আর তুমি তার নাম কি রেখেছো?বললাম,'হারব' রেখেছি।তিনি বললেন, না! তার নাম হবে হাসান।এরপর হুসাইনের জন্ম হলে আমি তার নাম হারর রাখি।নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম শুনে বললেন, না! তার নাম হবে হুসাইন। এরপর প্রিয় সন্তানের জন্ম হয়, আমি তার নামও রাখি 'হারব'।অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম বললেন, না! তার নাম হবে মহাসসান। অতঃপর রাসূল সাঃ বলেন আমি এদের নাম হারুন আলাইহি সালামের ছেলেদের নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছি। তাদের নাম ছিল সবার,সুবাইর,মুসাব্বার।(মুসনাদে আহমদ,সহিহ ইবনে হিব্বান)

হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু এর কানে আজান :

হুসাইনের জন্মের পর রাসূল সালাম তার কানে আজান ও একামত দিয়েছিলেন।(সুনানে আবু দাউদ)

মাথা মুন্ডন:

জাফর বিন মুহাম্মদ তার বাবা হতে বর্ণনা করেন, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসান হুসাইনের জন্মের সপ্তম দিনে তাদের মাথা মন্ডন করেন এবং চুল ওজন করে তার সমপরিমাণ সাদকা করেন। (তাবাকাত)

আকিকা:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান হুসাইনের জন্য একটি করে ছাগল আকিকা করেন। অন্যবর্ণনায় আছে দুটি করে ছাগল জবাই করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ সুনানি নাসায়ী)

খতনা:

জাবের (রা)থেকে বর্ণিত রাসূল সাঃ হাসান হুসাইন এর জন্মের সপ্তম দিনে তাদের আকিকা করেছেন এবং তাদের খতনা সম্পন্ন করেছেন। (বাইহাকী)
মোহাম্মদ বিন মুন কাদির বলেন, রাসূল সাঃ হুসাইনের সপ্তম দিনে তার খতনা করিয়েছে। (সহীহ বুখারী)

ভাই বোন :

ফাতেমার (রা) এর গর্ভে যেসব ভাইবোন জন্ম নিয়েছেন তাদের সংখ্যা :
১.হাসান বিন আবি আলী রাদিয়াল্লাহু ২.মুহাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু
৩.উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাদিয়াল্লাহু
৪.জয়নাব বিনতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

বাপ শারিকি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ভাই :
১.মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ

চাচা ফুফু :
১.তাহলে বিন আবু তালেব
২.আকিল বিন আবু তালেব
৩.জাফর বিন আবু তালেব
৪.উম্মে হানি বিনতে আবু তালেব

৫.জুমানা বিনতে আবু তালেব

মামা ও খালা :

১.যায়নাব (রা)
২.রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু
৩.উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪.কাসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু
৫.ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু

খিলাফতের দুর্যোগ কাল :

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ফিতনার দোয়া খুলে যায়।মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত হয় একের পর এক ফিতনা।মুনাফিকরা মুসলিমদের নিয়ে এ সময় নানারকম ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।অন্যদিকে মুসলিমরাও নিজেদের মাঝে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে।এভাবে এ সংকটময় সময় খেলাফতে গরু দায়িত্ব ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু এর মধ্য দিয়ে তার শাহাদাতের পর মুয়াবিয়া (রা) এর উপর আসে। তখন খুলাফায়ে রাশিদার সময় ও শাসনের আদর্শিক চিত্র অনেকটাই অনুপস্থিত ছিল।এ পরিস্থিতিতে মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহুকে পরামর্শ দেয়া হলো,ফেতনার সময় চলমান তাই আপনি পরবর্তী খলিফাদের জন্য কোন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যান। যাতে মুসলমানদের মাঝে কোন আর দ্বন্দ্ব লড়াই না হয়।ইসলামিক খিলাফত যেন বিভক্ত না হয় নিরাপদ থাকে।

খিলাফত নিয়ে চিন্তাভাবনার এক পর্যায়ে মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন।এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তিনি বেশ কিছু মানুষের সাথে পরামর্শ করে।ফলাফল স্বরূপ, নানা রকম মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।এছাড়াও কুফা থেকে কিছু লোক ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত নেওয়ার ব্যাপারে

মন্তব্য করেন।তখনো ইয়াজিদের আচরণ গত সমস্যাগুলো প্রকাশ হয়নি।তাই মুয়াবিয়া (রা) শেষমেষ ইয়াজিদের হাতে পরবর্তী খলিফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইয়াজিদের নামে বাইয়াত :

শাম ও ইরাকের লোকজনের মাঝে ইয়াজিদের নামে বাইয়াতের আওয়াজ উঠে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শাম ইরাক কুফা ও বসরার অধিবাসীরা ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণে একমত।

সকলের দৃষ্টি তখন হেজাজ এর দিকে।মুয়াবিয়া (রা) এর পক্ষ থেকে মক্কা মদিনার গভর্নর দের প্রতি নির্দেশ পাঠানো হয়।তখন মদিনার গভর্নর ছিলেন মারওয়ান ইবনু হাকাম।তিনি মদিনাবাসীকে জোড় করে বলেন,হে লোকসকল,এটা তো আবু বকর আর উমরের সুন্নাহ যে,তারা তাদের পরবর্তী খলিফার বাইয়াতের অসিয়ত করে গেছেন।সে হিসাবে আমিরুল মুনিনিন মুয়াবিয়াও চাইছেন,পরবর্তী খলিফা হিসাবে তার ছেলে ইয়াজিদের নামে বাইয়াত নেওয়া হোক।

সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর (রা). এ কথা শুনে তিনি বলেন,হে মারিয়ান,এটা ভুল।এটা মোটেও আবু বকর আর উমরের সুন্নাহ না।বরং রোম ও পারস্যের সম্রাটের নীতি।তাঁদের কেউই নিজেদের ছেলেদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে যাননি।আর না তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

সে সময় হিজাযবাসীর দৃষ্টি ছিলো নবী পরিবারের দিকে।বিশেষ করে হুসাইন (রা) এর দিকে।মুয়াবিয়া (রা) এরপর হুসাইন (রা) কে খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ও হকদার মনে করতো।

এ ঘোষনা শোনার পর তাের দৃষ্টি চলে যায় হুসাইন ইবনু আলি,আব্দুল্লাহ ইবনু উমর,আব্দুর

রহমান ইবনু আবু বকর,আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর,আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) এর দিকে।যোগ্যতার বিচারে তারা ছিলো শ্রেষ্ঠ।তাই হিজাযবাসী তাদের মতামত শুনতে চায়।

অন্যদিকে তাদপর চোখে ইয়াজিদের আবস্থান সেসব সাহাবিদের ধারের কাছেও ছিলো না।তাই তারা সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হিসাবে ইয়াজিদকে মেনে নিতে পারেননি।এ কারণে তারা ইয়াজিদকে খলিফা হওয়ার বিরোধিতা করেন।তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমৃত্যু নিজেদের মতের উপর অবিচল থাকেন।যাকে কেন্দ্র করে মক্কা-মদিনার গোলযোগ এবং কুফা-কারবালার গণহত্যা সংঘটিত হয়।

মুয়াবিয়া (র) এর মদীনায় সফর:

৫১ হিজরিতে আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়া (রা) হুজায সফর করেন।প্রথমেই তিঁনি মদীনাতে যান।যেখানে সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বৈঠকে বসে ইয়াজিদের বাইয়াতের কথা উঠে আসে।তখন সাহাবিগণ তাঁর মতের সাথে সরাসরি বিরোধিতা করেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা(রা) জীবিত ছিলেন।মুয়াবিয়া (রা) তাঁর নিকট উপদেশ নিতে যান।সাহাবিগণ যে বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন,সেটি উল্লেখ করে বলেন,আম্মাজান,আমি একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি।কিন্তু সাহাবিরা আমার মতের বিরোধিতা করছেন।

আয়িশা(রা) তখন বলতে শুরু করেন,'শুনেছি, আপনি তাদের ওপর জুলুম করেছেন।এমনকি তাদেরকে জীবনের হুমকিও দিয়েছেন। আপনার এমনটা করা মোটেও উচিত হয়নি।

মুয়াবিয়া (রা) বলেন,আম্মাজান,এটা পুরোপুরি মিথ্যা করা।আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের সম্মান করা আমার উপর ওয়াজিব। তাদের সাথে আমি মোটেও এমন আচরণ করতে পারি না।বাস্তবতা হলো,শাম,ইরাকসহ বঠ বড় শহরের সাধারণ মুসলিমরা ইয়াজিদের নামে বাইয়াত নিয়েছে।এদিকে খিলাফতের বাইয়াতও সুসম্পন্ন। কিন্তু এ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি শুধু বিরোধিতা করছেন।এখন আপনিই

বলুন,মুসলিমরা একজনের খলিফা হওয়ার ব্যাপারে একমত, এদিকে বাইয়াতও সম্পন্ন হয়ে গেছে।এখন আমি কি এ বাইয়াত ভেঙে দিতে পারি?

আশিয়া(রা) বলেন, 'তাদের সাথে কোন ধরনের কঠোরতা করবেন না।সম্মানের সাথে তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন।'

মুয়াবিয়া (রা) বলেন, 'আম্মাজান, আমি এমনটাই করব।এটা আমার ওয়াদা।'

মুয়াবিয়া (রা) তখনও মদিনায় অবস্থান করছেন।এসময় হুসাইন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) ভাবেন,তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে হয়তো তাদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হবে।সেজন্য তারা পরিবার নিয়ে মক্কায় চলে যায়।ওদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর (রা) ও হজের নিয়তে মক্কায় যান।

মুয়াবিয়া (রা) এর মক্কা - সফর:

মদিনার পর মুয়াবিয়া (রা) মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন।হজের মৌসুমি হওয়ায় তিনি হজের নিয়তে মক্কায় যান।সেখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) কে ডেকে পাঠান।তাকে বলেন, ইবনু উমর আপনি আমাকে বলতেন, আমিরবিহীন একটি রাতও আপনার পছন্দ নয়।আর আমি সেই আমির নির্ধারণের জন্যই ইয়াজিদের কাছ থেকে এ শর্তে খলিফা হওয়ার বাইয়াত নিয়েছি - যাতে আমার মৃত্যুর পর মুসলিমদের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির চর্চা ছড়িয়ে না পড়ে।সবাই এমতের পক্ষে অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি, আপনি এখনও এর বিরোধিতা করছেন!তাই আমি আপনাকে সতর্ক করছি,মুসলিমদের সার্বোভৌম ঐক্যমতের ভেতরে ফাটল ধরাবেন না।এমন কিছু করবেন না যাতে বিশৃঙ্খলা আরও ছড়িয়ে পড়ে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলেন,আমিরুল মুমিনিন, আপনার আগে আরও খলিফা ছিলেন।তাদেরও সন্তানাদি ছিলো,এখনও আছে। আপনার ছেলে কিন্তু তাদের চেয়ে কোনভাবেই এগিয়ে নেই।তারপরও তারা আপন ছেলেদের জন্য সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি, যা এখনি আপনি দিয়ে বসে আছেন।তারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে উম্মাহর সামগ্রিক উপকারিতার বিষয়টি সামনে রেখেছেন।আর আপনি কি করেছেন?আপনি আমাকে উম্মাহর বিশৃঙ্খলার ভয় দেখাচ্ছেন? মনে রাখবেন,আমি কখনোই উম্মাহর ভিতরে ফাটল ধরাব না।আমি সাধারণ মুসলিমদের একজন।তারা সবাই একমত হয়ে যেদিকে যাবে আমার মতও সেদিকেই থাকবে।

মুয়াবিয়া (রা) এরপর এ বিষয় নিয়ে আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর (রা) এর সাক্ষাৎ করেন।তিঁনিও কঠোরভাবে ইয়াজিদকে খলিফা হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, ‘ আমি কখনোই তাকে খালিফা হিসাবে মেনে নিব না।’

এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এর মুখোমুখি হোন।তিঁনিও আগের দুজনের মতো বিষয়টি নাকচ করে দেন।’

মুয়াবিয়ার আলীকে সঠিক পরামর্শ :

সাহাবীদের এমন কথাবার্তা শুনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতাশ হয়ে পড়েন।তখন হুসাইন (রা),আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) প্রমুখ গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন।তারা তাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন-

আমিরুল মুমিনিন, আপনার জন্য এটা মোটেও উচিত নয়, আপনি আপনার ছেলে ইয়াজিদের জন্য আমাদেরকে এভাবে বাইয়াতে বাধ্য করবেন!আমরা আপনার সামনে তিনটি পদ্ধতি পেশ করছি, এগুলো আপনার পূর্ববর্তী খলিফাদের সুন্নাহ-

১.এমন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আল্লাহর রাসুল যা করেছেন,আপনিও তা করতে পারেন।তিঁনি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে কাউকে সরাসরি নির্বাচন করে যাননি,আভাস রেখে গেছেন।নির্বাচনের দায়িত্ব ছিলো সম্পূর্ণ উম্মাহর হাতে।

২.এ পরিস্থিতিতে আবু বকর যা করেছেন,আপনিও তা করতে পারেন।তিঁনি একজনের নাম ঘোষণা করে গেছেন-যিনি তার বংশীয় না, আর না তার কোন আত্মীয়। প্রস্তাবিত লোকটির ব্যাপারেও কারও কোন আপত্তি ছিল না।

৩.অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যা করেছেন,আপনিও তা করতে পারেন।তিঁনি খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি দলকে।

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি এগুলোই।এছাড়া ৪র্থ কোন পদ্ধতি আমরা বুঝি না।সেটা গ্রহণের তো প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) একই সিদ্ধান্তের কথা বলেন,এখন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহন হয়ে গেছে।আর আপনাদের কারো বিরোধিতা করা বৈধ নয়।

মুয়াবিয়া (রা) এর চিরবিদয় ও অসিয়ত:

তিনি ৬০ হিজরি, রজব মাসে চিরবিদায় নেন।মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পূত্র ইয়াজিদকে উপদেশ দিয়ে যান,যা তার পক্ষ থেকে অসিয়ত স্বরুপ-

তিঁনি বলেন,শোনো পুত্র, আমার ধারণা হচ্ছে, ইরাকবাসী হুসাইনকে তেমার বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করাবে।যদি এমন হয় আর তুমি বিজয় হও,তাহলে তাঁর সাথে কোন অন্যায় আচরণ করবে না।তাঁকে নি:শর্তে ক্ষমা করে দিবে।হুসাইন রাসূলের বংশধর। এ কারণে যে সম্মান তাঁর প্রাপ্য, তুমি তাঁকে সেটা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না।এমনিতেও মুসলিমদের উপর তাঁর রয়েছে বিপুল অধিকার।

ওয়ালিদের কাছে ইয়াজিদের চিঠি:

ক্ষমতায় বসে ইয়াজিদ মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনু উতবা আবি সুফিয়ানকে চিঠি পাঠান।ইয়াজিদের চিঠির ভাষাছিলো-

হুসাইন ইবনু আলি,আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহনের চাপ দেবে।এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ছাড়া দেওয়া যাবে না।

ওয়ালিদের হাতে চিঠি পৌঁছালে সে চিন্তায় পড়ে যায়।একদিকে খলিফার আদেশ, অন্য দিকে যাদের নামে নির্দেশ এসেছে, তাঁরা সকলেই আল্লাহর রাসুলের প্রিয় সাহাবি।তিনি কিভাবে এ নির্দেশ পালন করবেন, সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে সে।

সে সময় তার মারওয়ান ইবনুল হাকামের কথা মনে হয়, যিনি তার পূর্বে মদিনার গভর্নর ছিলেন।পরামর্শের জন্য তিনি তাকে ডেকে পাঠান।

মারওয়ান এসে বলেন,এখনও আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবাদ মদিনায় প্রচারিত হয়নি।ভালো হবে,এদলের লোকদের দ্রুত ডেকে পাঠাও। যদি তারা ইয়াজিদের নামে বাইয়াত নেয় তাহলে তো কথায় নেই।নয়তো তাদেরকে সেখানেই শেষ করে দাও।

ওয়ালিদ তখনই আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু উসমানকে তলব করেন।তার মাধ্যমে হুসাইন ইবনু আবি তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে ডেকে পাঠায়।বার্তাবাহক তাঁদের কাছে যায়।তাঁরা তখন মসজিদে নববিতে। সেখানে তাঁদের গভর্নরের পাঠানো বার্তা শোনানো হয়।

জবাবে তাঁরা বলেন, ‘তুমি যাও,আমরা আসছি।’

বার্তাবাহক চলে যাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর হুসাইনকে বলেন, ‘এখন তো আমিরের মজলিসের সময় নয়।নিশ্চয় আমাদের ডেকে নেওয়ার পিছনে কোনো মতলব আছে।

হুসাইন (রা) নিজ বুদ্ধি মত্তায় বিষয়টি বুঝে নেন।বলেন,আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মুয়াবিয়া ইন্তেকাল করেছেন।এখন ওয়ালিদ চাইছে, মদিনার জনগণ এ সংবাদ শোনার আগে আমরা ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহন করে নিই।তা না হলে আমাদের বাধ্য করা হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তার সাথে একমত হয়ে বলেন,আপনি যা বলখেন সেটাই হবে হয়তো।এখন তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কি?
হুসাইন বলেন, ‘আমি এখনই গিয়ে আমার লোকদের জড়ো করবো।’তাদের নিয়ে যাব ওয়ালিদের কাছে। তাদেরকে বাইরে রেখে আমি ভিতরে প্রবেশ করবো,যাতে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি।’

হুসাইন (রা) একদল যুবককে নিয়ে ওয়ালিদের কাছে যান। সেখানে তিনি মারওয়ানকে দেখতে পান।

হুসাইন ওয়ালিদের সামনে ইয়াজিদের চিঠি মেলে ধরেন।সেখানে মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবার ও বাইয়াত গ্রহনের আহ্বান ছিলো।

মুয়াবিয়া (রা) র মৃত্যুর সংবাদে চোক প্রকাশ করেন এবং বাইয়াতের ব্যাপারে বলেন,লুকিয়ে বাইয়াত গ্রহন করাটা আমার ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না।তারচেয়ে ভালো হবে, লোকজনকে একত্র করে, তাদের সামনে বাইয়াতের বিষয়টি পেশ করা।তারপর যা হবে,সবার সামনে হবে।
ওয়ালিদ ছিলো শান্তিকামী লোক,তিনি হুসাইন (রা) এর প্রস্তাব খুশিমনে মেনে নেন এবং তাঁকে মসলিস ত্যাগ করার অনুমতি দেন।

কিন্তু মারওয়ান হুসাইনের কৌশল ধরে ফেলেন।তাই তাঁর সামনে বলে ওঠে,'হুসাইন যদি এখান থেকে অক্ষত বেরিয়ে যায়, তাহলে তাঁকে আর ধরা যাবে না।তাই বলছি, এখনইতাকে বন্দি করা হোক। যতক্ষণ না তাঁর কাছে থেকে বাইয়াত নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না।প্রয়োজনে তাঁকে হত্যা করা হবে।

হুসাইন (রা) এই জঘণ্য কথার উত্তর দেন,আমাকে হত্যা করার তুমি কে?আমি যাচ্ছি পারলে আটকাও আমাকে!

এই কথা বলে কাউকে তোয়াক্কা না করে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।
মারওয়ান, ওয়ালিদকে গালমন্দ করতে থাকে আর বলে, তিমি নিশ্চিত সুযোগ টা হাতছাড়া করলে।
ওয়ালিদ তখন বলে,আল্লাহর কসম, হুসাইনকে হত্যার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার রাজত্ব আর সম্পদও যদি আমার হাতের মুঠোয় চলে আসে।তবুও আমি কখনোই এ কাজ করবো না। কিয়ামতের মাঠে যে হুসাইনের রক্তের দায় নিয়ে উঠবে, আল্লাহর কাছে তার মুক্তির কোন সম্ভাবনাই থাকবে না!

দুজনের মক্কা যাত্রা :

রাতের আধারে একদল অনুসন্ধনী হুসাইন (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এর খোঁজে। খবর পেয়ে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তার ভাই জাফরকে নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে পড়েন।নিরাপদ স্থানে গিয়ে হুসাইন(রা) এর অপেক্ষা করতে থাকেন।
হুসাইন (রা)ও পরিবার পরিজন নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্য রওনা হোন।দ্রুত সময়ে তাঁর সাথে দেখা হয় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এর।তারপর তাঁরা এক সাথে মক্কায় যান।

ইয়াজিদ এ ঘটনা শুনে ওয়ালিদকে গভর্নর পদ থেকে চ্যুত করেন এবং আমর ইবনু সাইদ আল-আশদাক কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। সেনাপতি প্রধান বানানো হয়

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এর ভাই আমর ইবনু যুবাইরকে।যার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এর বিরোধ ছিলো।যার সুযোদ ইয়াজিদ গ্রহন করে চায়।

যে সব কারণে তিনি কুফা অভিমুখে রওনা হলেন:

১.প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়,বিষয়টি আল্লাহর ফয়সালা ছিলো।
২.তাঁর সাথে মুয়াবিয়া (রা) যে সন্ধি হয়েছিলো তাঁর একটি শর্ত এমনও ছিলো, মুয়াবিয়া (রা) এর পরে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি শুরার মাধ্যমে সংঘটিত হবে।

হুসাইনকে কুফাবাসীদের চিঠি:

কুফাবাসী মুয়াবিয়া (রা) এর মৃত্যু সংবাদ শুনতে এবং জানতে পারে হুসাইন (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবমে যুবাইর (রা) সহ কিছু সম্মানিত সাহাবি ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়নি।এমন পরিস্থিতিতে সুলাইমান ইবনু সুরাদ আল-খুযায়ির এর ঘরে বৈঠক করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন হুসাইন (রা)কে কুফায় ডেকে পাঠাবেন এবং চিঠি লিখেন।

আমাদের নেতা হুসাইন,ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণে রাজি নই।আপনি কুফায় চলে আসুন।আমরা সবাই আপনার হাতে বাইয়াতের অপেক্ষায় আছি। আপনি এলেই ইয়াজিদের নিয়োগকৃত চাটুকার গভর্নরকে আমরা কুফা থেকে তাড়িয়ে দিব।

এরপর ঠিক দুদিন পর এ প্রসঙ্গে আরেকটি চিঠি আসে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। সেখানে এক দিকে ছিল ইয়াজীদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের ফিরিস্তি। অপটিকে হুসাইনকে সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস। আরো ছিল হোসাইন এর হাতে তাদের বাইয়াতের অঙ্গীকার। জনা কয়েক লোকের একটি প্রতিনিধি দলও আসে তার কাছে।

চিঠি আর প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফাই যেতে আগ্রহী হন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তিঁনি নিজে না গিয়ে একজন প্রতিনিধিকে পাঠানো সঙ্গত মনে করেন। তাই চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকিলকে কুফায় পাঠান। একটি চিঠি দেন তার হাতে। চিঠিতে লেখা ছিল -

কুফাবাসি সালামের পর বলি তোমাদের চিঠি আমি পেয়েছি। আমি আমার আপন চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হয়েছে আমাকে চিঠি দিবে। সে আমাকে সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি দিলেই আমি কোথাও উদ্দেশ্যে রওনা হব।

মুসলিম ইবনেহ আকিল কুফায় পৌঁছে মুখতার ইবনু আবি ওবাইদের ঘরে মেহমান হন।স্থামীয় নেতাদের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকে নিয়মিত। যখন নতুন কেউ আসে হুসাইন এর চিঠি পড়ে তিনি শুনান। এতে সকলে আবেগে ভালোবাসা গলে পড়ে।সাধারণ কিছু মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে ইবনু আকিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন সাধারন জনতা ইয়াজিতে হাতে বায়াত গ্রহণে রাজি নয়। হুসাইনের হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য মুখিয়ে আছে তারা। কিছুদিনের ভেতরে ১৮ হাজার মানুষ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নামে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করে। এর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

মুসলিম ইবনে আকিলে চিঠি :

কুফাবাসীর এমন আচরণে মুসলিম ইবনে আকিলের মনে এ বিশ্বাস গেড়ে বসে এ মুহূর্তে যদি হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় আসেন,তাহলে ইরাকবাসী তার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে।আর হিজাজের লোকেরা তো আগে থেকেই তার পক্ষে পানি পড়ে। সকল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মুসলিম ইবনে আকিল মনে করেন কুফার পরিস্থিতি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুকূলে। এটা বুঝতে পেরে মুসলিম ইবনু আকিল হুসাইন এর কাছে চিঠি লিখেন। তাকে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানান।

পাল্টে গেল পরিস্থিতি :

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি পাঠানোর পরপরই দ্রুত কুফার পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সে সময়ের কুফা গভর্নর ইবনে বাসির (রা) তিনি সমস্ত ঘটনা জেনে যান। মুসলিম ইবনু আকিল হুসাইনের হয়ে লোকদের কাছ থেকে বাইয়াত নিচ্ছেন এ খবর চলে যায় তার কানে।

তখন কোফার লোকদের জোর করেন নোমান ইবনু বাসির।তাদের সামনে তিনি বক্তব্য পেশ করেন -
শোনো কুফা বাসি,আমরা কারো সাথে লড়াইয়ে নামতে চাই না। কিন্তু তোমরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো, পরিত্যাগ কর নিজ ইমামের বাইয়াত তাহলে আল্লাহর কসম যতক্ষণ পর্যন্ত তরবারির বাট আমার হাতে থাকবে, আমি আমার তরবারি দিয়ে তোমাদের শায়েস্তা করে ছাড়বো।
আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনে সাঈদ আলহাদরামি ছিল বনু উমাইয়ার মিত্র। রোমান ইবনে বাসীর এর বক্তব্য শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে যান,বলে, এখন আপনার সামনে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে কঠোর না হলে আপনি কখনোই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। আর যে সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন ভীরু আর কাপুরুষরাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

নোমান ইবনবাসী জবাব দেন,আল্লাহর অনুগত্য করতে গিয়ে আমাকে যদি ভীরু ও কাপুরুষ বলা হয় তাহলে আল্লাহর বিরোধিতাই লিপ্ত হয়ে বীর বা সাহসী উপাধির তুলনায় এটাই আমার কাছে বেশি উত্তম!

এরপর আব্দুল্লাহ মুসলিম আর অপেক্ষা না করেই ইয়াজিদের কাছে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে তিনি কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

আমিরুল মোমিনিন, যদি চান কুফা আপনার অধীনে থাকুক। তাহলে ফুফার জন্য শক্ত মনের কোন গভর্নর পাঠান। বর্তমান গভর্নর নোমান ইবনু বাশির আসলেই দুর্বল আর নয়তো দুর্বলতার ধারণ করে আছেন!

পাশাপাশি কুফা থেকে আরো কয়েকজন ইয়াজিদকে চিঠি লেখে।

ইয়াজিদের কাছে যখন চিঠিগুলো পৌঁছে তখন সে পিতার বিশ্বস্ত পরামর্শক সারজুনকে ডেকে আনেন।ইয়াজিদ তার কাছে পরামর্শ চায়,কাকে কুফার গভর্নর করা যায়?
সারজুন বলেন, ওবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে কুফার গভর্নর বানানো হোক।
কিন্তু ওবায়দুল্লাহর সাথে ইয়াজিদের সম্পর্ক ভালো ছিল না।
সারজুন এটা বুঝতে পেরে বলে এখন যদি আপনার সম্মানিত পিতা মুয়াবিয়া জীবিত থাকতেন আর এমন পরামর্শ দিতেন তখন কি আপনি সেটা মেনে নিতেন না?
ইয়াজিদ বলে, অবশ্যই।
সাজন তখন মুয়াবিয়ার একটি নির্দেশ নামা বের করে দেখায়। সেখানে ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করার ফরমান ছিল।

কুফার ক্ষমতার পরিবর্তন :

সারজুনের পরামর্শ অনুযায়ী ইয়াজিদ কাজ করেন। তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়োগ পত্র পাঠায় - ইবনু যিয়াদ, খলিফা ইয়াজিদ কর্তৃক তোমাকে কুফা ও বসরার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
ইয়াজিদ তাকে একটি চিঠিও লিখেন। সেই চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, তুমি কুফায় পৌঁছে মুসলিম ইবনে আকিলকে বন্দী করে হত্যা করবে। আর নয় তো তাকে কুফা থেকে বের করে দেবে।

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে চিঠি পেয়ে ইবনে যিয়াদ, তার কর্তব্য পালনের জন্য কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

ইবনু যিয়াদ কুফায় গমন :

ইবনু যিয়াদ কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।সে সময় কুফার লোকেরা আগে থেকেই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমন প্রত্যাশী ছিল। তারা আগে বেশিরভাগ মানুষই হুসাইন রাদিয়াল্লাহুকে দেখেননি। তারা তাকে চিনতো না।

এমন সময় যখন ইবনু যিয়াদ কুফায় পৌঁছায় তখন তাকে মনে করতে থাকে এ লোকটাই হচ্ছে হুসাইন। লোকজন খুশি মনে তাকে অভিবাদন জানায় -আপনাকে স্বাগতম, হে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় নাতি!

ইবনু যিয়াদ এসব দেখে চুপ থাকেন প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হোন।তার বুঝতে বাকি থাকে না কুফায় হুসাইনের একদম জয়জয়কার অবস্থা।

কুফা হুসাইনের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন দলে দলে আসতে থাকে আল্লাহর প্রিয় নাতিকে এক নজর দেখবে বলে।

এদিকে তখনও কুফার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব ছিলেন নোমান ইবনে বাসির। তিনি ইয়াজিদের প্রতিনিধি ও সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও নবী পরিবারের প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই হুসাইনের আগমন সংবাদ শুনেও তিনি কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেননি। বরং নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন।

ইবনু যিয়াদ তার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। লোকজনও তার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নোমান তাদের আনন্দ ধ্বনি শুনে শুনতে পায়।তিনি ভাবলেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই হুসাইনের উদ্দেশ্যে বলেন, হুসাইন,কুফার যে দায়িত্ব আমার হাতে অর্পিত, তা আমি কখনো আপনার হাতে সমর্পণ করব না। তাছাড়া আমি আপনার সাথে যুদ্ধেও জড়াতে চাই না।

ইবনু যিয়াদ তখনো নীরবভাবে সবকিছু শুনছিলেন। দরজার একবারে নিকটে এসে এবার তিনি আওয়াজ দেয়, দরজা খুলুন, আমি ইবনে যিয়াদ। খলিফা ইয়াজিদ এর

পক্ষ থেকে আমাকে কুফার নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।তারপর ইবনে যিয়াদ,নুমান ইবনে বাশিরের ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দেয়।

ইবনু যিয়াদের প্রথম ভাষণ :

পরের দিন সকালবেলা ইবনু যিয়াদ কুফাবাসীকে এক জায়গায় সমবেত করে তাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে কি ভাষণ দেন -

হে লোক সকল, খলিফা ইয়াজিদ ইবনু মুয়াবিয়া আমাকে তোমাদের গভর্নর বানিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা জুলুমের শিকার তাদের সাথে যেন ন্যায় বিচার করি। ন্যায্য পাওনা থেকে যে বঞ্চিত তাকে যেন সেটা ফিরিয়ে দিই। যারা আমার আদেশ মেনে চলবে তাদের সাথে যেন ভালো ব্যবহার করি।আর এ ব্যাপারে যাদের আচরণে সন্দেহভাজন মনে হবে তাদের সাথে যেন কঠোরতা করি।
সবাই কান খুলে শুনে রেখো, আমি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে তার আদেশ বাস্তবায়নের জোরালোভাবে কাজ করব। আমি হবো ভালো লোকদের জন্য দয়ালু পিতা, অনুগতদের ভাই। আর যারা আমার আদেশে বিরোধিতা করবে, তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে আমার চাবুক ও তরবারি। তাই তোমাদের প্রতি একটাই আহ্বান - তোমরা নিজেদের প্রতি সুবিচার করতে চাইলে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে নিজেদের দূরে রাখো।

তারপর তিনি শহরের গণ্যমান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বলেন -

এ শহরে যত ভিনদেশী ও খলিফা বিরোধী আছে, তাদের সবার বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে দ্রুত জমা দাও। যারা এমন লোকদের তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে, তারা আমার কাছে ভালো মানুষ হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা এটা করবে না তাদের গোত্র বা বংশের হয়ে আমাকে অন্তত এইটুকু নিশ্চয়তা দিবে -তাদের কেউ আমার বিরোধিতা করবে না।

যারা এটাও করবে না তাদের সাথে আমার বোঝাপড়া হবে খুবই ভয়াবহ। আমি তাদেরকে হত্যা করব। আর যারা খলিফার বিরোধিতা করবে, প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে তাদের বরখাস্ত করব। আর তাদেরকে তাদেরই দরজার সামনে ফাঁসিতে ঝুলাবো।

ওবায়দুল্লাহ যিয়াদের পদক্ষেপ :

ওবায়দুল্লাহ বিভিন্ন গুপ্তচর মারফত খোঁজ নেওয়া শুরু করে এবং মুসলিমের অনুসারী ও সমর্থকদের খবর জেনে যায়। মুসলিমের সন্ধান বের করার জন্য তিনি এক লোককে দায়িত্ব দেন। তাকে তিনি ৩০০০ দিরহাম দিয়ে যে কোন মূল্যে মুসলিমকে খুঁজে বের করার জন্য বলে

ওই লোকটি জামে মসজিদে গিয়ে লোকদেরকে স্থির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে মসজিদের পিলারে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এক লোককে আবিষ্কার করে ফেলে। লোকটি দীর্ঘ সময় যাবত নামাজ আদায় করছিল। লোকটি তার নামাজ শেষ করার অপেক্ষা করতে থাকে। নামাজ শেষ হলে লোকটি, তার কাছে গিয়ে চুপিচুপি বলল, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক, আমি স্বামীর যিল কালা গোত্রের মাওলা। আল্লাহ অপার অনুগ্রহ যে তিনি আমাকে আহলে বায়তের ভালোবাসা হৃদয়ের গভীরে লালন করার সৌভাগ্য দান করেছেন। যারা আহলে বাইয়তাকে ভালোবাসে তাদের প্রতিও আমার অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। আমি ৩০০০ দিরহাম নিয়ে এসেছি আমার ইচ্ছে তাহলে বাইকের কাউকে কে পেলে দিয়ে দিব। শুনতে পেয়েছি এখানে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি এসেছে। আপনি কি আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারবেন, তাহলে আমি দেরহাম গুলো তার কাছে পৌঁছে দিব। তিনি এটি তার মিশন বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে পারবেন।

লোকটা তার কথা শুনে বললো,তুমি মসজিদে এত মানুষ বাদ দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে গেলে কেন? সে বলল, আপনাকে দেখে আমার একজন সৎ সজ্জন মানুষ

বলে মনে হয়েছে। আমার মন বলেছে আহলে বাইয়তের প্রতি ভালোবাসা লালন করেন।

লোকটি বলল, তুমি ভুল করোনি। আমি তোমার ভাইদের একজন। আমার নাম মুসলিম বিন আওসাজা।তোমাকে পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, কিন্তু প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ বর্তমানে কুফায় জালিম ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ অবস্থান করছে। তার থেকে নিরাপদ হওয়া যাচ্ছে না। তুমি আমাকে ওয়াদা দাও এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ গোপন রাখবে।কাউকে বলবেনা। লোকটা ওয়াদা দিল।

লোকটি তার ধূর্ত কৌশলের সম্পূর্ণ সফল হয়ে যায়। লোকটি তাকে মুসলিমের নিকট নিয়ে যায়। মুসলিমের সাথে সে দিনভর কথা বলে। তাকে ৩০০০ দিরহামের থলিটিও হাদিয়া দেয়। রাতের বেলা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে চলে আসে এবং তাকে মুসলিমের ব্যাপার সব তথ্য দিয়ে দেয়। তাকে এও জানিয়ে দেয় তিনি বর্তমানে হানি বিন ওরওয়ার ঘরে অবস্থান করছেন।

হানি বিন ওরওয়াকে গ্রেফতার :

শেষ সময় মোহাম্মদ বিন আশআস এবং আসনা বিন খারেজা ইবনে যিয়াদ নামীয় কুফার দুজন বিশিষ্ট লোক ইবনে যিয়াদের দরবারে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে। সে তাদেরকে হানি বিন ওরয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, সে তো কয়েকদিন যাবত অসুস্থ। সে বলল আমি তো শুনেছি সে ঘরের সামনে প্রতিদিন বসে থাকে। তাহলে সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে না কেন।?তারা বলল, আচ্ছা আমরা তাকে আপনার বিষয়ে বলব।আপনার কাছে তাকে নিয়ে আসব। তারা সেখান থেকে উঠে হানির ঘরে যায়। তাকে ইবনে যিয়াদ যা বলেছে তা শোনায়। এরপর তারা তাকে তখনই ইবনে যিয়াদের কাছে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। তারা ভেবেছিল এতে ইবনে যিয়াদের আক্রোশ কিছুটা হলেও মিটবে।ফানি তার খচ্চর উঠে রওনা দেয় কিন্তু যখন ইবনে যিয়াদের ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে তখন হানির মনে ভয় শুরু হয়।সেটা সঙ্গীদের বলল আমার বড্ড ভয় হচ্ছে তার কাছে গেলে সে আমাকে আবার

কি করে। তারা বললো তুমি এমন কি করেছো যে, সে তোমাকে কিছু করবে? শেষমেষ তাদের অভয় বাণী শুনে ইবনে যিয়াদের কাছে যায়। তাকে দেখি ইবনে যিয়াদ কেষ্ট হাসি-হাসে আবৃত্তি শুরু করে :

আমি তোমার জীবন বাঁচাতে চাই আর তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও, বলো তোমার এমন মন্দ উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে কে তোমার ক্ষমা করবে?

হানি বলল :হ্যাঁ আমির! আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

ইবনে যিয়াদ বলল :এর চেয়ে বড় স্পর্ধা আর প্রতারণা কি হতে পারে যে, তুমি মুসলিম বিন আকিলকে কোথায় নিয়ে এসেছো, তাকে নিয়ে যে ঘরে আশ্রয় দিয়েছো, মানুষকে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছো?হানি তখন মুখের উপর এসব অস্বীকার করে।সে সাফ জানিয়ে দেয় এর কিছুই সে জানেনা। তখন ইবনে যিয়াদ, ওই লোককে ডাক দেই যে তার ঘরে ছিল। ওই লোককে দেখার সাথে সাথে হানির বুঝে আসে,সে ছিল গুপ্তচর।

হানি বলল :আল্লাহর কসম হে আমির! আমি মুসলিমকে কুফায় আমন্ত্রণ জানায়নি, এ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানিনা।এরপর সে যতটুকু জানে ততটুকু ইবনে যিয়াদের কাছে বর্ণনা করে।শেষে সে বলে, আমি এখনই মুসলিমকে আমার ঘর থেকে বের করে দেব । সে যেদিকে ইচ্ছা সে দিকে যাবে। আমি তাকে বের করে দিয়েই আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো।

ইবনে যিয়াদ বলে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমার হাতে তুলে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

হানি বলল, এটি কিভাবে সম্ভব, আমি আমার মেহমানকে হত্যার জন্য আপনার কাছে সোপর্দ করবো?এটি আমি কোনদিন করতে পারবো না।

এ কথা বলার সাথে সাথে এমনি যিয়াদ একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে হানিকে প্রচন্ড আঘাত করে। সজোরে থাপ্পড় দেয়। নাকি ভারী একটি ঘুসি বসিয়ে দেয়। তার ভ্রু কেটে তাকে বন্দী করে।

এ খবর কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝে পৌঁছায়।আমর বিন হাজ্জাজ যুবায়দীর নিকট পৌঁছালে সে মূল হাজ্জাজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে নিয়ে ইবনে যিয়াদের বাসভবন ঘেরাও করে।সে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, হানি যদি নিরাপদ থাকে তাহলে কোন অভিযোগ নেই আমাদের। আমরা হানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।

ইবনে যিহাদ তা কাজি শুরাইহকে কে বলল , তুমি ভেতরে গিয়ে হানি কে দেখে কে হানির ব্যাপারে সংবাদ দাও। কাজী সুরাইহ ভেতরে গিয়ে দেখতে পান হানি জীবিত আছেন। এ সংবাদ তাদেরকে জানানো হলে বিন হাজ্জাজ উপস্থিত লোকদের বলে যদি সে জীবিত থাকে তাহলে আর ফিতনা করার কি দরকার? তোমরা ফিরে যাও।

ইবনে যিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও :

মুসলিম বিল আকীলের নিকট যখন হানি বিনুর ওরওয়ার নির্যাতিত হওয়ার খবর এলে সে থাকতে পারলেন না। তার হাতে বাইআত হওয়া লোকদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান সকলকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে রওনা হোন।ইবনে যিয়াদ এ খবর শুনে, প্রাসাদের ভেতর সুরক্ষা বলে নিশ্চিত করে। খুব দ্রুত যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে নেয়।
প্রাসাদে প্রবেশ করেই সে সময় তার নিকট থাকা কোফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মজলিসে বসে। কারণ এদেরকে দিয়ে কুফাবাসীদের উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে। যে তার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে।

যখন মুসলিম বাহিনী নিয়ে ইবনে যিয়াদের প্রাসাদের কাছে পৌঁছে যায়। ইবনে যিয়াদ এ সকল বিশিষ্ট লোককে আদেশ দেয়, যেন তারা বাহিনীর সদস্যদেরকে উপদেশ

দিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা বলে এবং সিরিয়া থেকে ইয়াজিদের বাহিরের কুফার কাছাকাছি এসে গেছে বলে তাদের ভয় দেখায়।তার কথা মতো নেতৃস্থানীয় লোকেরা মুসলিমের বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে শুরু করে। তাদেরকে আরো বলে তারা যদি ফিরে না যায় তাহলে রাষ্ট্রের কোন আনুকুল্য তারা পাবেনা এবং সীমান্তে নিয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। এ ধরনের বিভিন্ন কথায় তাদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে কুফার মহিলারাও মুসলিমের সাথে বের হওয়া তাদের স্বামী ও সন্তানদেরকে বিভিন্ন কথা বলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। বাবারা তাদের সন্তানদের দোহাই দিয়ে চলে যেতে বলল। এক একজন মহিলা এসে তার ভাই এবং ছেলেকে এ বলে ফিরিয়ে যেতে দেখা গেছে, তোমরা না থাকলেও কোন সমস্যা নেই অন্যান্যরা তো আছে।
তারাই যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট।

অনেক পুরুষও তার ভাই ও ছেলেকে এ বলে যুদ্ধ ত্যাগে প্ররোচিত করে যে,সিরিয়ার বাহিনী কাল কি এসে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তখন কি দশা হবে তোমাদের?

এ সমস্ত কথায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচন্ড ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মুসলিমের বাহিনী তুমুল ভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তারা একে একে মুসলিম থেকে ফিরে যেতে থাকে এবং মুসলিমের সৈন্য সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ে মাত্র ৩০০ থেকে ৫০০ তে। এদের অধিকাংশই ছিল মুযহাজ গোত্রের। ইবনে যিয়াদ তার অন্যতম আজ্ঞাবহ ওবায়দুল্লাহ বিন কাছেরকে মুযহাজ গোত্র লোকদের ফেরানোর জন্য বলল। তাদেরকে সে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও আমিরের শাস্তির ভয় দেখায়।ইবনে যিয়াদ আরো কয়েকজনকে এভাবে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধে নিরুৎসাহিত করতে নির্দেশ দেয়।আর নেতৃস্থানীয় লোকদের নিজের কাছে ধরে রাখে। ইবনে যিয়াদের এমন দ্রুত পদক্ষেপ এবং ভীতি সৃষ্টির জঘন্যতম প্রয়াসের কারণে মুসলিমের বাকি সৈন্যরাও তাকে ত্যাগ করতে লাগলো। অবশেষে তার সাথে

মাত্র ষাট জনের মত বাকি থাকে। এরপর মুসলিমের এ বাহিনী এবং ইবনে আজ আস সাবাদ বিন রিবয়ী ও কা'কার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অসম যুদ্ধ খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি হওয়ার কথা ও না। যুদ্ধের সময় কা'কা বুঝতে পারল যারা যুদ্ধ করছে তারাও মূলত জীবন বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করছে।তখন সে তাদের জন্য যুদ্ধের ময়দান ত্যাগের সুযোগ করে দিল।এতে সবাই পালিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেল। মুসলিম বিন আকিল যুদ্ধের ময়দানে একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন।

মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা :

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম ইবনে আকিল একা নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ায় উপায়ন্তর না দেখে তিনি আত্মগোপনের জন্য কুফার কলিতে গলিতে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। মুসলিম ছুটতে ছুটে একটি ঘরের সামনে এলেন। ঘরের ভেতর থেকে একজন মহিলা বের হয়ে এলো। তিনি বললেন, আমাকে একটু পানি পান করাও। মহিলা পানি দিয়ে ভেতরে যায়। কিছুক্ষণ পর সে বাইরে এসে দেখে মুসলিম দরজায় বসে আছেন। মহিলা বলো তোমাকে তো বড় সন্দেহ হচ্ছে তুমি কে? মুসলিম নিজে পরিচয় দেয় এবং বলেন তোমার কাছে আমি কি আমার থাকার কোন ব্যবস্থা হবে? মহিলা 'হ্যাঁ' সুযোগ জবাব দিল।কিন্তু ঐ মহিলার ছেলের সাথে মোহাম্মদ বিন আশ-আস, যে ইবনে জিয়াদের একান্ত আগ্রহ তার বন্ধুত্ব ছিল। সে বিষয়টি ইবনে আশআসকে বলে দেয়।তখন ইবনে যিয়াদ মুসলিমকে ধরার জন্য সৈন্য পাঠায়। মুসলিম সৈন্য দেখি তরবারি কোষ মুক্ত করে ফেলেন। তখন ইবনে আসআশ তাকে নিরাপত্তা দিয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য বলেন। তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

মুসলিমকে যখন গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন তিনি জোরে জোরে কান্না শুরু করলেন। ইবনে আস তখন বলল, বিদ্রোহী বিপ্লবী মানুষের এমন পরিস্থিতি কান্না বড় বেমানান। বিদ্রোহে জয় বা পরাজয়ের যে কোন একটি অবশ্যই হবে এটি মাথায় নিয়েই তো বিদ্রোহ করতে হয়। মুসলিম বললেন,

আমি নিজের জন্য কাঁদি না, আমার জীবনে কি বা মূল্য আছে? এক মুহূর্তের জন্য আমি কখনো নিজেকে ভালোবাসিনি। কিন্তু আমি কান্না করছি আমার ভাই হোসাইন ও হোসাইনের পরিবারের জন্য। তারা তো আমার কি কির উপর ভিত্তি করে কুফার পথে রওনা হয়ে গেছে। উপবাসির গাদ্দারী বিষয়টি তারা তো জানেনা।

মুসলিম কান্নারত অবস্থাতেই আশআস কে বলল, তুমি আমাকে যে নিরাপত্তা দিয়েছো তা ইবনে যিয়াদ মানবে না। বরং আমাকে সে যে কোন মূল্যে হত্যা করবে।। তুমি আমার একটি উপকার করো, একজন লোককে হোসাইন এর কাছে পাঠিয়ে দেবে সে যেন তাকে গিয়ে আমার করুন অবস্থা ও কুফা বাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে এবং এখানে আসতে বারণ করে।এ কুফাবাসীরা তার বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের প্রতি তিনি এতই কষ্ট পেয়েছেন যে তিনি দোয়া করতেন আল্লাহ যেন মৃত্যু বা শাহাদাতের মাধ্যমে এদের থেকে মুক্তি দেন। এদের স্বভাব এখন পর্যন্ত একটুও বদলায়নি। প্রকৃতির মধ্যেই তাদের প্রতারণতা প্রতারণা ঢুকে গেছে। সে যেন ভুলেও এদের কাছে না আসে।

ইবনে আশআস বললো,তোমার আবেদন আমি পূর্ণ করব। আমি ইমেজ রিয়াদকে তোমার নিরাপত্তা দানের বিষয়টিও বলবো। এরপর সেই হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি একটি পত্র লিখে ইয়াস আব্বাস তাইকে তার কাছে দুত হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। ইয়াস ফিরে আশা পর্যন্ত তার পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মুসলিমকে নিয়ে ইবনে আশআস ইবনে যিয়াদের কাছে যায় এবং সে যে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে তাও বলে। ইবনে যিয়াদ বলে, তোমাকে তো তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পাঠাইনি। তাকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠিয়েছি। এ বলে তার নিরাপত্তা নাকচ করে দেয়। এ সময় মুসলিমের খুব পিপাসা পেলে তিনি একটু পানি পান করতে চান। আম্মার বিন উবা তাকে পানি এনে দেয়। কিন্তু তিনি পান করতে পারলেন না। মুখের সামনে নেওয়ার আগেই তার শরীরে জখমের রক্তে পানি রঞ্জিত হয়ে যায়।তাকে দেখেই হেড়েন গলায় বলে উঠলো, তাই তোমার একমাত্র প্রাপ্য। আমি তোমাকে হত্যাই করব।

মুসলিম বললেন, তাহলে আমাকে একটু ওসিয়ত করার মত সুযোগ দাও।
ইবনে যিয়াদ বলল, কি ওসিয়ত করতে চাও কর?

মুসলিম উপস্থিত লোকদের উপর চোখ বুলালেন, তাতে ওমর বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস কে দেখতে পেলেন। ওমরের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ওমর তুমি সম্পর্কে আমার আত্মীয় হোও।আমি তোমার কাছে কিছু অসিয়ত করতে চাই। তবে গোপনে, একটু এককোণে আসবে কি? আস্তে আস্তে বলবো। কিন্তু ওমর উঠলো না। সে বারবার ইবনে যিয়াদের দিকে তাকাতে থাকে, ইতস্তত করতে থাকে। পরে ইবনে যিয়াদ অনুমতি দিলে সে মুসলিমের কাছে যায়।

মুসলিম তাকে বলল, কোফায় একজন লোক আমার কাছে ৭০০ দিরহাম পায়। তুমি তাড়াতাড়ি করে দিও।আমাকে শহীদ করার পর ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে আমার দেহটা নিয়ে হোসাইনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।কারণ আমি তাকে বলেছিলাম সব মানুষ তোমার সাথে আছে। সংবাদ শুনে সে হয়তো রওনা হয়ে গেছে। এখন তো পরিস্থিতি দেখতেই পাচ্ছো।

ওমর মুসলিমের কথা শুনে ইবনে যিয়াদের কাছে এসে সব বলে দেয় । ইবনে যিয়াদ সব কথা মঞ্জুর করল। সে বলল, হোসাইন যদি আমাদের কাছে না আসে তাহলে আমরা তার কোন ক্ষতি করব না।কিন্তু সে যদি এখানে আসে তাহলে তাকে ছাড়া হবে না। এরপর মুসলিমকে প্রাসাদের উপর তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তাকবীর দিতে দিতে যেতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! যে জাতি আমাদের সাথে গাদ্দারি করেছে, আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদের বিচার করুন। তাদের ফয়সাল আপনার কাছে সোপর্দ করলাম ।

উপরে নেওয়ার পর বুকায়র বিন হুমরান নামের এক পাষান্ড তার গর্দান উড়িয়ে দেয় এবং উপর থেকে তার মাথা ও দেহ নিচে নিক্ষেপ করে।

হানি বিন ওরওয়াকে হত্যা :

ইবনে যিয়াদ তার পাষণ্ডতা ও নিঃসংশতার উদাহরণ হিসেবে আরেকটি কাজ করল। সে হানিকেও হত্যার আদেশ ছিল। এ আদেশ শুনেই হানি তার গোত্র মুজাহাজে নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে সাহায্য চায় এবং তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু কেউ তার স্বপক্ষে একটি কথাও বললো না। হানিকে হত্যার পরে মুসলিম ও হানির মৃত দেহকে জনসম্মুখে শুলীবৃদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর মুসলিমের সহযোগিতায় যারা প্রথমে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্য থেকে দুজনকে হত্যা করা হয়।

কুফায় যাবেন হুসাইন:

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুফাবাসীর পক্ষ থেকে একে একে ১৫০ টি পেয়েছি এসে পৌঁছে। অনেক প্রতিনিধিও এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। ওদিকে মুসলিম ইবনু আকিল কুফায় তার নামে আঠার হাজার লোকের বাইআত নেন।সেই সাথে তাকে কোথায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান । সার্বিক পরিচিতি বিবেচনা করে তিনি কুফায় যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন।

যাত্রার আগে এবং যাত্রাপথে অনেকেই তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি কখনোই কোথায় যাবেন না। ইরাক ও কুফা বাসীর অঙ্গীকার ও বায়াতের উপর একদমই ভরসা করবেন না। সেখানে যাওয়াটা আপনার জন্য বিপদজনক হতে পারে।

উমার ইবনে আব্দুর রহমানের পরামর্শ :হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যাবেন এ খবর পেয়ে তিনি তার কাছে হাজির হন। তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনি এমন শহরে যাওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেখানে ইয়াজিদের নিয়ে যেত প্রশাসক ও তার অনুসারীরা রয়েছে। তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার। সাধারণ মানুষ রীতিমতো সেখান থেকে তাদের অংশ বুঝে পাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে -যারা আপনার কাছে

অঙ্গীকার করেছে আপনাকে ডেকেছে তাদের কাছে, ওই লোক বলেই না আবার আপনার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়।আর যারা আপনাকে নিজের প্রিয় পাত্র বলে দাবি করছে, নেতাদের সাথে মিলে তারাই না আবার আপনার সাথে প্রতারণা করে বসে!

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম মনোযোগ দিয়ে তার পরামর্শ শুনেন।কৃতজ্ঞতার সাথে বলেন, আমি আপনার পরামর্শ ও উপদেশ স্মরণ রাখব ইনশাআল্লাহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পরামর্শ :

আব্দুল আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারেন, হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যাওয়া সিদ্ধান্তের উপনীত হয়েছেন। তখনই ছুটে আসেন তাঁর কাছে। তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তো এমন কথা শুনেছি। এগুলো বাস্তবতা কতটুকু? এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

হোসাইন জবাব দেয়, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমি কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজকালের ভেতরেই বেরিয়ে পড়বো ইনশাআল্লাহ।

তখন ইবনে আব্বাস বলেন, ভাই, আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে কি একটু বলবেন, এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? আপনি যাদের কাছে যেতে চাইতেছেন, নিজেদের মনোনীত আমিরকে তারাই শহীদ করে দিয়েছে।আর আপনি ঐ লোকগুলো আহ্বানে সেখানে যেতে চাইছেন?তার আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে আহ্বান জানিয়েছে, যখন তাদের মাঝে একজন আমি রয়েছে। আর জনতা তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর সবাই তার দ্বারা প্রভাবিত। বলে আমার ভয় হচ্ছে। যারা আপনাকে আহ্বান করেছে তারাই আপনাকে ধোঁকা দিবে। আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

হোসাইন উত্তর দেন, কিগো আব্বাস, আপনার কথা সঠিক। আমি এ নিয়ে ইস্তেখারা করব। তারপর যেটা ফয়সাল আসবে সেটাই করব।

পরের দিন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো যান হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। তাকে বলেন, ভাই আমার, আমি ধৈর্য ধরতে চাই, কিন্তু ধৈর্য ধরে

থাকতে পারিনা। আপনার কথা যাত্রা নিয়ে খুবই ভয় হচ্ছে আমার। আমি আপনার এবং আপনার পরিবারের ধ্বংসের আভাস পাচ্ছি।ইরাকবাসী আগে থেকেই ভঙ্গের ব্যাপারে বিখ্যাত। তাদের কাছে যাবেন না। আপনি এখানেই থাকুন। আপনিতো হিজরাদের মুসলিমদের সর্বাধিনায়ক। তবুও যদি তারা পীড়াপীড়ি করতে থাকে তাদের বলুন -আগে তোমাদের আমি কে শহর থেকে বের কর, তারপর আমাকে ডাকলে আমি আসবো। তারপরও যদি মক্কা ছাড়তেই চান তাহলে ইয়েমেনের চলে যান। সেখানে সুরক্ষিত দূর্গ ও পাহাড় রয়েছে। সেখানে আপনার পিতার অনেক অনুসারী কেউ পেয়ে যাবেন। আপনি বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে নিরাপদে বসবাস করবেন। কথাও কলম দিয়ে করবেন সত্যের প্রচার ও সাহায্য।

হুসাইন বলেন, ইবনে আব্বাস, আমি জানি আপনি একজন বিচক্ষণ পরামর্শ। কিন্তু আমি যে দৃড় সংকল্প করে ফেলেছি। এখন এই সাথে করতে মন সায় দিচ্ছে না।

আব্বাস বলেন,ভাই আমার, যদি আপনি যাওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েই নেন, তাহলে অন্তত পরিবার নিয়ে যাবেন না। আমার ভয় হয় আপনাকে হয়তো তাদের সামনেই হত্যা করবে। যেমনটা আমিরুল মোমিনীন উসমান ইবনু আফফানের সাথে করা হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের পরামর্শ :

কোন কোন দুর্বল বর্ণ নাই এমন এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু, হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোথায় যাওয়ার ব্যাপারে প্ররোচিত করেছেন। কিন্তু সহিহ বর্ণনা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, তিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে না যাওয়ার ব্যাপারে নসিহত করিয়েছেন। মক্কা ছেড়ে কুফা যাওয়া যে কতটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি এও বলেছেন আপনি কি তাদের কাছে যাবেন যারা আপনার বাবাকে হত্যা করেছে, আপনার ভাইকে অপবাদ দিয়েছে?

আবু সাঈদ ক্ষুদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ :

আবু সাঈদ খোজি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হোসেন কি সীরাতিক আমি ব্যর্থ হয়েছি, তুমি ঘরে অবস্থান করো আল্লাহকে ভয় করো। খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর পরামর্শ :

তিঁনি বলেন আমি হোসেনকে বলেছিলাম, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, মানুষের মাঝে শুদ্ধ বাঁধিও না। তোমার কাজ কি আমি সমর্থন করতে পারছি না। কিন্তু সে আমার কথা শুনে নি।

আব্দুল ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ :

তিনি মদিনা থেকে তাঁর দুই ছেলে হামদ এবং আওনের মাধ্যমে হোসেন রাদিয়াল্লাহ আনহু এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তাতে লিখেন, আমি আল্লাহ দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি,আমার পুত্র আপনার কাছে পৌঁছার সাথে সাথে আপনি আপন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। আপনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, এটা আপনিও শেষ হয়ে যাবেন আপনার পরিজন শেষ হয়ে যাবে।
কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তা মাললেন না। আব্দুল ইমে জাফর ভাবলেন, হোসেন হয়তো মদিনার গভর্নর এমন বিন সাইদ বিন আশের ভয়ে মদিনায় না এসে কুফায় যেতে যাচ্ছে। তাই তিনি আমর বিন সাইদের কাছে হোসেন রাদিয়াল্লাহ আনহু এর ব্যাপারে নিরাপত্তা চাইলে আমর বলেন, আপনি কি কাগজে যা মন চাই লিখে আনুন আমি তাতে স্বাক্ষর করে দিব। তখন তিনি একটি পত্র লিখেন যাতে গভর্নর স্বাক্ষর করে দেয়। ও টুনি অন্য রূপ :
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। অমর বিন সাইদ বিন আশেরর পক্ষ থেকে হুসাইনের প্রতি,
আম্মা বাদ

আল্লাহ আপনাকে যাবতীয় বিপন্নতা ও বিরম্বনা থেকে রক্ষা করুন। সঠিক পথে দিশা দান করুন। আমি জানতে পেরেছি,আপনি ইরাক যাচ্ছেন।আল্লাহ আপনাকে রাকিবের কত টাকা থেকে হেফাজত করুন। আপনি সেখানে গেলে আমি আপনার নিহত হওয়ার আশঙ্কা করছি। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি তাদের সাথে চলে আসুন। আপনার নিরাপত্তা, সম্মান, মর্যাদা এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে চুল পরিমাণ ত্রুটি করব না। আমি আল্লাহকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখি। ওয়সসালামু আলাইকুম।

কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না।

ওমরা বিনতে আব্দুর রহমানের পরামর্শ:

তিঁনিও তার কাছে নিজের আশঙ্কার কথা লিখে পত্র লিখেন এবং ফিরে আসার ব্যাপারে তাগিদ দেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুতি পরামর্শ:

তিনি বলেন, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনি ইরাকে যাবেন না। তারা যদি আপনাকে হত্যা করে তাহলে আমাদেরকে গোলাম আর বা দিতে পরিণত করবে।

প্রখ্যাত কবি ফারাযদাকের পরামর্শ:

তিনি হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে সাফা নামক জায়গায় সাক্ষাৎ করেন. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন , **আপনাকে আমার কাছে প্রিয় কেউ নেই। আল্লাহই তো সবকিছুর ফয়সালা করেন**। কিন্তু বাহ্যত তরবারি তো উমাইয়াদের হাতে দেখতে পাচ্ছি।

মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহর পরামর্শ:

মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা হোসেন রাদিয়াল্লাহ আনহু এর কুফায় রওনা হওয়ার কথা শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন এবং তাকে অনুনয়ের সাথে বললেন, ভাই আপনার চেয়ে পরম প্রিয় আমার নিকট আর কেউ নেই, আপনার যে সম্মানিত আমার কাছে কেউ নেই। আপনাকে নসিহত করার ক্ষেত্রে আমি কোন কমতি করতে পারি না। ইয়াজিদের বাইআত না করা অবস্থায় আপনার জন্য কোন শহরে অবস্থান করার ঠিক না।আপনি কোথাও যাবেন না। দূর থেকে মানুষের নিকট আপনার পয়গাম প্রেরণ করুন। তারা যদি আপনার হাতে বাইয়াত হয় এবং আপনাকে খলিফা মনোনীত করে তাহলে তো আর কোন সমস্যা থাকবে না। আর যদি তারা আপনাকে খলিফা হিসেবে মেনে না নেয় তাহলেও তো কোন সমস্যা নেই। এটা আপনার মর্যাদাই নূন্যতম চিড় ধরবেনা।এতে না পরা দিনের ক্ষতি আছে না দুনিয়ার ক্ষতি আছে। আমি এভাবে ভয় পাচ্ছি যে আপনি কোন এক এলাকায় গেলে দেখা যাবে ওই এলাকার কিছু লোক আপনার সঙ্গে দিবে আর কিছু লোক আপনার বিপক্ষে চলে যাবে।আর শুরু হয়ে যাবে তুমুল যুদ্ধ, হয়তো সে যুদ্ধে প্রথম তীর আপনার শরীরে বিদ্ধ হবে । তখন দেখা যাবে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম মানুষের প্রাণ সবচেয়ে হীন অবজ্ঞাগত ও তুচ্ছ অবস্থায় বিসর্জিত হবে।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে অবশ্যই যেতে হবে।
মাহমুদ বললেন,অন্তত আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন পরিস্থিতি শান্ত হলে তারপর বের হন। আর যদি পরিচিতি প্রতিকূলে যায় তাহলে আপনি মরুভূমির কোথাও

আত্মগোপন করবেন অথবা পাহাড়ি লুকিয়ে পড়বেন। বারবার আপনার অবস্থার পরিবর্তন করবেন। সাথে সাথে মানুষের অবস্থা ও আপনার সামনে আরও স্পষ্ট হবে। আপনি বুঝতে পারবেন তারা কি আপনাকে চায় নাকি ভিন্ন কিছু চায়। তখন আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া একেবারেই সহজ হয়ে যাবে। বিশ্বাস করি পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়ার যথেষ্ট প্রজ্ঞা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। আল্লাহ না করুক! পরিস্থিতি যদি ব্যতিক্রম কিছু হয় তাহলে আপনি না কোন সমস্যায় পড়ে যান.

হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ভাই আমার, আমি জানি তুমি আমাকে অত্যাধিক ভালোবাসো বলেই এমন নসিহত করছ। হতে পারি তোমার কথাই ঠিক কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ :

তিঁনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু কে একাধিকবার নসিহত করেন।যখন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু ইয়াজিদের বাইয়াতের ব্যাপার অস্বীকৃতি জানায় তখন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, তোমরা কৌশল হিসেবে তার বাইআত সাময়িকভাবে গ্রহণ করে নাও। কিন্তু পরবর্তীতে যদি সকল মানুষ তার হাতে বায়াত হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তোমরা দোষী সাব্যস্ত হবে না। আর যদি মানুষ তাকে মেনে না নেই তাহলে তোমাদের উদ্দেশ্য এমনিতেই সাধিত হয়ে গেল। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষে মক্কা থেকে মদিনায় আসার পর তাঁর কাছে খবর পৌঁছালো যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছেন।তখন তিঁনি দুই দিনের দূরত্ব অতিক্রম করে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিঁনি জবাব দিলেন ইরাকে। তাঁর সাথে তখন অনেকগুলো চিঠি ছিল।তিনি সেগুলো তাঁকে দেখিয়ে বললেন, এগুলো কথাবাসীদের বাইয়াত এবং আনুগতি চিঠিপত্র। এতগুলো চিঠিপত্র পাঠিয়ে তারা আমাকে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছে।তখন তিঁনি বললেন, দেখুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে আল্লাহতায়ালা দুনিয়া এবং আখেরাতের যেকোনো একটু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু তিঁনি আখেরাতকেই বেছে নিয়েছেন আর আপনারা নবীর বংশধর।

এজন্য দুনিয়ার কোন কর্তৃত্ব আপনারা লাভ করতে পারবেন না। আমার এমন কি মনে হয়। এটি কি আপনাদের জন্য আল্লাহ কল্যাণকর সাব্যস্ত করেছেন। আপনি যাবেন না। কিন্তু হোসেন রাদিয়াল্লাহ নিবিড় আশার ঘরে আচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু এর কথা মারলেন না। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন। বিদায় জানিয়ে বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে বলতেন,হুসাইন আমাদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বের হয়ে গেছে, আমরা পারিনি তাঁকে ঠেকাতে।অথচ আর বাবা ও ভাইয়ের সাথে তারা কেমন আচার করেছে তা চিন্তা করে উপদেশ নিতে পারতো, সে তো সব ফিতনায় দেখেছে। দেখেছি কিভাবে মানুষ তাদের সহযোগিতা বর্জন করেছে। তাঁদের বিপদে ফেলে ময়দান থেকে পালিয়েছে। এগুলো চিন্তা করা তার উচিত ছিলো, এ জাতীয় কোন পদক্ষেপ এক মুহূর্তের জন্য গ্রহণ না করা

হুসাইম রাদিয়াল্লাহ আনহু এর কুফায় যাওয়ার সময় সমস্ত কথাই সাহাবায়েকেরাম ও তাবেয়ীরা বলেছিলেন। এমনটাই ছিল তাঁদের দর্শন। তাই ইয়াজিতকে সবার শেষ শ্রেষ্ঠ মনে করে তার হাতে বাইয়াত হননি। পরম তাদের ভাইয়াদের উদ্দেশ্যই ছিল বিবাদ এড়িয়ে চলা এবং উম্মাহর মাঝে ফাটল তৈরি না করা।

ইয়াজিদের চিঠি :

বিভিন্ন সংবাদের মাধ্যমে ইয়াজিদ যখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহ কুফা অভিমুখে রওনা হবেন, তখন সে ইবনে আব্বাস হয়ে গেছে পত্র লিখে হোসাইনকে তা থেকে নিবৃত করার অনুরোধ জানায়।কারণ সে সময় তিঁনিই ছিলেন বনু হাশিমের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ মুরুব্বী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব।

সে লিখে -
আমার মনে হয় হোসাইন কি ইরাকের কিছু মানুষ প্ররোচুত করেছে এবং তাকে খিলাফতের লোভ দেখিয়েছে। আপনি তো সেসব লোকের ব্যাপারে জানেনই তারা কতটা ধুরন্ধর এবং গাদ্দার। এখন যদি হুসাইন তাদের কাছে যায় তাহলে তা হবে

আত্মীয়তার সব বন্ধন শেষ করে দেওয়ারই নামান্তর। আপনি তো মুরুব্বী ও আস্থাভাজন আপনি তাকে ফিরান।

চিঠির উত্তরে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ লিখেন,
আমার মনে হয় হোসাইন তোমার অনিষ্ট করার জন্য বের হচ্ছেনা। বাকি আমি তাঁকে সবসময় নসিহত করছি, যেন সোহার্দ্য সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়, বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়।

অন্যদিকে সেসময় অতি দ্রুত একের এক ঘটনা ঘটেই চলছিল। এদিকে মুসলিম বিন আকিল কুফাশ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে অনেক লোকের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে ফেলে। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

কোফার পথে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসলিমের হত্যা সম্পর্ক অবগতি :

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে ষাট হিজরির জিলহজ মাসে বের হয়েছিলেন। মদিনার গভর্নর আমর বিন সাঈদ ইবনুল আস এই খবর শুনে বড় শংকায় পড়ে গেলেন। তিনি তার ভাইসহ একদল প্রতিনিধি হুসাইনের নিকট প্রেরণ করেন। তারা তাকে বললো তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না। তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন -

সূরা ইউনুস, আয়াত ৪১

لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُون َ

অর্থ:
আমার কাজ আমার জন্য আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমি যা করি তার জন্য তোমরা দায়ী নও, আর তোমরা যা করো তার জন্য আমি দায়ী নই"

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরিবার এবং কুফার ষাট জন গণ গণ্যবান লোককে নিয়ে সামনে যেতে লাগলেন। তখন মারওয়ান বিন হাকাম ইবনে জিয়াদের কাছে এমন পত্র প্রেরণ করে-

হুসাইন তোমার এলাকায় রওনা দিয়েছে, তুমি ভুলে যেও না এ হচ্ছে হোসেন বিন ফাতেমা। আর ফাতেমা হচ্ছে রাসূল সাঃ এর মেয়ে। আল্লাহর কসম! হুসাইনের নিরাপত্তার চেয়ে দুনিয়ার কোন মানুষই নিরাপত্তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি অনুরোধ করব তুমি তার সাথে এমন কোন কাজ করবে না যার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ওসসালাম।

এমন বিন সাঈদ তার কাছে পত্র লিখেন। তাকে হোসাইনের ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে বলেন। তিনি লিখেন, হোসেন তোমার কাছে আসছে, আর এটি এমন পরিস্থিতি যখন মানুষ স্বাধীন থেকে গোলাম হয়ে আবার গোলাম থেকে স্বাধীন হয়ে যায়।

ইয়াজিদের নিকট যখন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কুফায় আসার সংবাদ পৌঁছে, তখন সে ইবনে যিয়াদকে সতর্ক করে পত্র লিখেন -

আমার কাছে সংবাদ এসেছে হুসাইন কুফাই যাচ্ছে। দেখো তোমার দায়িত্ব অবস্থায় এবং তোমার এলাকাটাই এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আর কারো শাসনামলে এবং কারো এলাকায় হয়নি। সুতরাং তুমি কি করবে ভেবে নাও। মনে রাখবে!এটি এমন পরিস্থিতি যখন স্বাধীন মানুষ গোলামে পরিণত হতে পারে আবার গোলাম স্বাধীন মানুষের পরিণত হতে পারে।

ইবনে যিয়াদের প্রতি রক্ষা কৌশল:

ইবনে যিয়াদ কুফাবাসী ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু এর মাঝে যেন কোন যোগাযোগ না থাকতে পারে এজন্য অনেকগুলো পরিকল্পনা হাতে নেয়।সে কুফায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। একদম সৈন্যকে হুসাইনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তৈরি করে। তাদেরকে অনেক উপঢৌকন ও অর্থ দিয়ে অভিযানে নামায়।এসৈন্য দলের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় হুসাইন বিন তামিম তাহুরীকে। তাকে সেনাবাহিনী সহ কাদেশিয়ার প্রান্তরে অবস্থানের জন্য বলে দেয়।আরো কয়েকটি দল তৈরি করে। তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। এরপর হোসাইন বিন তামিম এর কাছে ফরমান পাঠায় যেন প্রত্যেক অপরিচিত ব্যক্তিকে পাকড়াও করে এবং কাউকে যেন কুফায় আসতে না দেয় এবং যেতেও না দেয়। এরপর আবার আদেশ জারি করে যেন ওয়াকিসা ও শামের পথে এবং বসরার পথে কেউ যেতে না পারে। এধরনের বিভিন্ন পদক্ষেপে মাধ্যমে তার টার্গেট ছিল হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কুফা বাসীদের মাঝে সব ধরনের সম্পর্ক নিঃশেষ করে দেওয়া।

অপরদিকে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার পথে ছুটতে লাগলেন তিনি জানতেন না যে তার বের হওয়ার পর কুফায় কত চড়াই উৎরাই হয়ে গেছে। তিনি হাজেজ নামক জায়গায় পৌঁছালে কুফা বাসীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে কায়েস বিন মুসহিরর সাইদাবিকে কুফায় পাঠান। কিন্তু কায়স যাওয়ার পথে হোসাইন বিন তামিমের হাতে বন্দি হন এবং তাকে ইবনে যিয়াদের কাছে পাঠানো হলে, সে তাকে প্রকাশ্যে নিশংসভাবে হত্যা করে।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকজন দুতকে মুসলিম বিন আকিল এর উদ্দেশ্যে পাঠান (মুসলিম যে কুফায় নিহত হয়েছে তা তিনি তখনও জানতেন না) কিন্তু এ দুত বন্দী হয়ে ইবনে যিয়াদের কাছে গেলে, সে তাকেও সকলের সামনে হত্যা করে। ইবনে যিয়াদ মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলেন যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে যখন তিনি শুনতে পেয়েছেন যে কুফায় কাউকে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে দেয়া হয় না। তখন তার সামনে সমূহ আশংকার পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। ওই সমস্ত এলাকার অনেক মানুষ তাকে

সতর্ক করেছেন যেন সামনে না বাড়েন।কারণ ইবনে যিয়াদের সৈন্যরা কুফায় যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু তারপরও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আশার আলো দেখতে লাগলেন। কেননা তাঁর কাছে মুসলিম খবর পাঠিয়েছে বিশাল সংখ্যক মানুষ তার হাতে বাইয়াত হয়েছে। তিঁনি আশায় ছিলেন এদের মধ্যে হয়তো কুফার বেসামাল পরিস্থিতি অনুকূলে আনা সম্ভব হবে। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জুবালা নামক জায়গায় পৌঁছান, কেউ কেউ বলেন 'শারাফ' নামক জায়গায় পৌঁছান তখন তাঁর কাছে মুসলিম বিন আকিল ও হানি বিন ওরওয়া এবং আব্দুল্লাহ বিন বাকতারের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছায়। এ খবর তিনি জানতে পারেন,কুফায়তার ভক্তবৃন্দরা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেনি।

খবরটি ছিল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য বজ্রঘাতেরর ন্যায়।এতে তিঁনি দারুন চোট পান। বিষাদে ছেয়ে যায় পুরো কাফেলা। একদিকে তাঁর আত্মীয় মারা হলো, অন্যদিকে তাঁর ভক্তরা তাদের সাহায্য পরিত্যাগ করেছে।এটি ছিল তার কলিজায় আগুন ধরানো সংবাদ। হুসাইনন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সংবাদ শোনার পর সঙ্গীদেরকে তা অবহিত করেন।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু করতে তার সঙ্গীদের মাঝে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা :

মুসলিম বিন আকিলের হত্যার সংবাদ পাওয়ার পর হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গীদের মাঝে ঘোষণা দেন :তোমরা চাইলে আমার সাথে থাকতেও পারো আবার যেতে চাইলে যেতে পারো। তখন অনেক মানুষ তাঁর থেকে বিছিন্ন হয়ে ডানে বামে চলে যায়। তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের অনেকেই হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুকে বলল, আল্লাহর কসম! আপনার এখান থেকে ফিরে যাওয়ায় উত্তম হবে।কোফায় আপনার কোন সাহায্যকারী নেই। পুরো সমর্থক নেই, বরং তাঁরাই আপনার শত্রু। তখন মুসলিম বিন আকিলের ভাই ও তার ছেলেরা জোর প্রতিবাদ করে উঠল,

আল্লাহর কসম! আমরা মুসলিম এর হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাবো না।হয়তো তার প্রতিশোধ নেব নয়তো তারমত আমরাও জীবন দেবো।

হুর বিন ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ :

এরপর হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গীদের প্রায় সবাই আলাদা হয়ে যায়। শুধু মক্কা থেকে যারা তাঁর সাথে বের হয়েছিল একমাত্র তারাই তার সাথে অবশিষ্ট থাকে। তিনি মুষ্টিমে এ কত লোক নিয়ে সামনে চলতে লাগলেন। যখন 'শুরাফ' নামক জায়গায় এলেন, সঙ্গীদের বেশি করে পানি সংগ্রহ করার জন্য বললেন। এরপর আবার সামনের দিকে চলতে থাকলেন। বেলা যখন দুপুর হয়ে গেল তাঁর একসঙ্গে জোরে তাকবীর দিয়ে উঠলো। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবির দিয়ে উঠলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে তাকবির দিয়েছে? সে বলল, খেজুর গাছ তাকবির দিয়েছে। তখন দুজন লোক বললো,এখানে খেজুর গাছ থাকার কথা না। হুসাইন বললেন তাহলে কি হতে পারে? তারা বলল, হয়তো সে উটের হাওদা দেখেছে।তখন লোকটা বলল আমারও মনে হয় এমন কিছু হবে।

বাস্তবে তাছাড়া ইবনে যিয়াদের অগ্রদলের উটের হাওদা সমূহ। যে দলের সেনাপতি ছিল হুর বিন ইয়াজিদ। তাদের সংখ্যা ছিল ১০০০। এখানেই হুরের বাহিনীর সাথে হোসাইনের সাক্ষাৎ হয়ে যায় এবং সে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পথ আগলে ধরে। হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন চিঠির দুটি ব্যাগ খুলে ঘুরতে দেখিয়ে বলে, এই চিঠিগুলো তো তোমরাই পাঠিয়েছো। কিন্তু হুর এবং তার সঙ্গে সবাই তা অস্বীকার করে। হুসাইন তার সঙ্গে কুফায় যেতে স্বীকৃতি জানান। হুর তাঁকে বলে, যদি আপনি কুফায় যেতে নাই চান তাহলে কুফার পথ ছেড়ে অন্য একটি পথ ধরুন, যাতে আপনাকে কুফায় যেতে না হয়। কিন্তু আপনাকে আমি মদিনায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারব না। আমি সর্বদাই আপনার সঙ্গেই থাকব। হুর চেয়েছিল এর মধ্যে সে ইবনে জিয়াদের কাছে তার করণীয় সম্পর্কে পত্র লিখবে এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুও ইয়াজিদের কাছে পত্র লিখবেন , তাহলে হয়তো বিষয়টি মীমাংসার কোন সুরত সৃষ্টি হয়ে যাবে। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথা

মতে,কাদেসিয়া ও উযাইবের পথ ছেড়ে একটু বামে গিয়ে সিরিয়ার পথের সামনে বাড়তে লাগলেন। ঘুরতার সঙ্গে সঙ্গে আপন বাহিনী নিয়ে চলতে থাকে। পথে হুর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যুদ্ধে না জড়াতে বলে এবং এ বলে তাঁকে বারবার ভয় দেখায় যে,যুদ্ধ জড়ালে আপনিও নিহত হবেন। উভয় বাহিনী এভাবে চলতে থাকে। যখন নামাজের সময় হতো তখন উভয়ই বাহিনী হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে নামাজ আদায় করতো।

ওমর ইবনে সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ :

চলতে চলতে হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু কারবালা নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। এখানেই তাঁর সাথে ওমর ইবনে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের বাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ হন। তার সাথে সিমার বিন যাওসান এবং হোসাইন বিন তামিমও ছিল। তার সংখ্যা ছিল চার হাজার। ইবনে যিয়াদ ওমর বিন সাইদকে হুসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বললে সে প্রথমে যেতে অস্বীকৃতি জানায়।কিন্তু সে তাকে পদযুক্ত করে হত্যার এবং তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় দেখায়।এতে সে ভীত হয় এবং হুসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাজি হয়ে যায়। হুসাইন কারবালায় এলে পুরো বাহিনী তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। তিনি ওমরের সাথে কথা বিনিময় করা শুরু করেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, কুফাবাসীরাই তাঁকে আসতে বলেছে। তিঁনি তাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠিগুলো এক এক করে দেখাতে থাকেন। যাতে বায়আতকারীদের নাম, সংখ্যা এবং তাদের সংক্রান্ত আরো অনেক বেশি উল্লেখ ছিল। ওমর তা দেখে ইবনে যিয়াদের কাছে এ মর্ম পত্র লিখে -

ইলাইহি ওয়া রাহমানির রাহিম
আম্মা বা'দ
হুসাইনের সাথে যেখানে আমার দেখা হয়েছে সেখান থেকেই আমি আপনার নিকট পত্র লিখছি।আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেন এসেছে? সে বললো,এখানকার আদিবাসীরাই তাকে নিয়ে এসেছে। এখন যেহেতু এখানকার আদিবাসীরা তা

অস্বীকার করছে বা তার সঙ্গ দিচ্ছে না তাই সে ফিরে যেতে চায়। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

ইবনে যিয়াদের সামনে যখন এ পত্র পড়া হলো তখন সে বিদ্রুপের হাসি হেসে এই কবিতা আবৃত্তি করলো -

যখন সে আমাদের হাতে নাগালে এসে গেছে তখন সে মুক্তি যাচ্ছে, কিন্তু এখন যে মুক্তির কোন উপায় নেই।

ইবনে যিয়াদ তখন ওমরের কাছে এ মর্মে পত্র লেখে -
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আম্মা বা'দ
তোমার পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে, তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি। এখন তুমি হোসাইন কে বলবে, সে যেন তার ব্যাপারে আমার হুকুম মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ তার ব্যাপার আমি যে ফয়সালা করব সে তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিবে। আর এটিই শেষ কথা। সে যদি তা মেনে নেয় তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। ওয়াসসালাম।
কোমর ইবনে সা'আদ এধরনের জবাব পেয়ে খুব কষ্ট পায়। সে বুঝতে পারে ইবনে যিয়াদ রক্তপাত এড়াতে আগ্রহী নয়। সে জানতো ইবনে যিয়াদের মত পৈশাচিক মনোবৃত্তির মানুষের ফয়সালা চূড়ান্ত জ্ঞান করে কেউ আত্মসমর্পণ করবে না। বাস্তবে তাই ঘটলো। এ প্রস্তাব হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে পেশ করা হলে, তুমি ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে, তিনি ওমর ইবনে সাদ এর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। যেগুলো নিম্ন রুপ-

১।তাকে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে দেয়া হোক।
২।অথবা সরাসরি ইয়াজিদের কাছে যেতে দেয়া হোক, তার সাথে একটি আপসংশা করে নিবেন। যেভাবে তার ভাই মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে করেছিলেন।

৩.কিংবা কোন সীমান্ত প্রদেশে যদি দেয়া হোক, কিন্তু সেখানে অবস্থান করবেন, তারা যেসব দায়িত্ব পালন করে, তিনটা বারন করবেন, একজন হয়ে জীবন যাপন করবেন।

বিশেষতঃ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার বিষয়ে তাকে জোরদার ভাবে বলেছে। এতে ওমর বিন সা'আদ ইবনে যিয়াদের নিকট চিঠি লিখে পাঠায় -

এ কঠিন পরিস্থিতি সমাধান বের হয়ে এসেছে, আপনি যদি এরকম একটি বিষয় মেনে নেন তাদের সব ঝামেলা চুকে যাবে।
এমন প্রস্তাবে যিয়াদ ও অনেক রাজী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সিমার যিনল যাওশান যে ইবনে যিয়াদের কাছে সেসময় উপস্থিত ছিল। সে বলল, ঠিক হবে না। আপনি হোসাইন কে আপনার হাতে বাইআত হওয়ার জন্য বাধ্য করেন। এতে ইয়াজিদের কাছে আপনার অবস্থা অনেক সমুন্নত হবে।
ইবনে যিয়াদের কাছে প্রস্তাবটা ঢের যুৎসই মনে হয়। হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব নাকোজ করে দেয় এবং সর্বাবস্থায় তাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

ওমর বিন সা'আদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে আবার আগের হুকুমটি পেশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন অবস্থাতেই তার হুকুম মেনে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হননি। তিঁনি বলেন তার হুকুমের উপর আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মরণই শ্রেয়।

তিঁনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ইবনে যিয়াদের হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারবো না।

এরপর হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গে এদেরকে নিজের মতো করে চলে যেতে বলেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে থাকার কথা বলে এবং যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

কারবালার যুদ্ধ ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত :

অবশেষে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় রয়নি।তাই তিঁনি জুমার জুমার দিন সকাল বেলা আপন সাথীদেরকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধ ভাবে সাজালেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যোদ্ধা ছিল ৩২ জন আর পদাতিক ছিল ৪০ জন। যুহায়র ইবনে হারব ইবনে কায়নকে ডানপাশের সৈনিকের দায়িত্ব দিলেন এবং হাবিব বিন মুহাজির কে বামপাশের সৈন্যদলের দায়িত্ব দিলেন। আব্বাস বিন আলীকে পতাকা দিলেন। তাদের তাবুগুলো পিছনে রাখলেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক কাঠ এবং বাঁশ সংগ্রহ করে তাবু গুলোর পেছনে গর্ত খনন করে তাদের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। যেন তারা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। ওমর বিন সা'আদ ও তার বাহিনী সাজালো।ডান পাশের বাহিনীর দায়িত্ব আমর বিন হাজ্জাজ যুবায়দীকে দিল। বাম পাশে দায়িত্ব সিমর যিল যাওসান এবং আযরা বিন কায়েস আহমাসিকে দিলো।অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব আযরাহকে দিলো।পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব সাবাত বিন রিবয়ি রিয়াহিকে দেয়।আর তার আজাদ কৃতদাস যুয়াইদের হাতে পতাকা দেয়।

যুদ্ধের শুরুর কিছু সময় পূর্বে হুর বিন যিয়াদ, যে সর্বপ্রথম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পথ আগলে ধরেছে এবং তাকে শুরাফ থেকে কারবেলা পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং নিজের বাহিনীর পরিত্যাগ করে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে এসে যোগদান করে।
দ্রুত সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথমে বল্লম যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষ থেকে একজন একজন করে সামনে এসে লড়াই করতে আসে।এক্ষেত্রে হুসাইন রাঃ এর সংঙ্গীরা অসীম বীরত্বের প্রমাণ দেয়। কারণ, তারা ছিল জীবন থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ। জীবনের মায়া তাদের ছিল না। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তার সকল সাথে নিহত হওয়ার পর তিঁনি যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে আসেন। তবে ওমরের বাহিনীর কেউ তাঁর মোকাবেলা পড়ার সাহস করিনি। তারা হুসাইনকে শহীদ করা গ্লানি নিজেদের কাঁধে নিতে চাচ্ছিল না। প্রত্যেকেই তা থেকে নিজেকে গুটানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু অসীম বীরত্বের সাথে তাদের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। তিনি কোন দুর্বলতা প্রকাশ করেননি।

এতে শিমার যিল যাওসান মনে পড়লো এতে কাল ক্ষেপণ হয়ে যাবে এবং সুযোগ ও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই সে নিজের অধীনের সৈন্যদেরকে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আক্রমণ করার আদেশ দেয়। বিভিন্ন প্রলভনে তাদেরকে এ ব্যাপারে তুমুল উৎসাহ দেয়। ফলে তারা তার উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম তাকে 'যুরআ বিন তামিমি' আঘাত করে।তারপর সিনান বিন নাখয়ী বর্শা বিদ্ধ করে। এতে তিঁনি পড়ে যান। সে তখন তাঁর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। কারো কারো মতে তাঁকে হত্যা করেছে আমর বিন বাত্তার তাগলাবি ও যায়েদ বিন রুকাদা হাইনি।তবে তাঁর মাথাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে শিমার যিন যাওশান।

এরপর তাঁর মাথা কি ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে যায় খাওলা বিন ইয়াযিদ আসবাহি।৬১ হিজরীর মহরমে ১০ তারিখে নিঃসংস ঘটনা সংঘটিত হয়। হুসাইন রাঃ এর সাথে ৭২ জন পুরুষ শহীদ হন। আর ওমর বিন সা'আদ এর বাহিনীর ৮৮ জন নিহত হোন।যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ওমর বিন সা'আদ ঘোষণা করে।কেউ যেন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিবারের মহিলাদের তাবুতে না যায়। সে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাথা ও মহিলা ও শিশুদের কাছে পাঠায়।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন হোসাইন এর মাথা ইবনে যিয়াদের সামনে পেশ করা হয়, তখন সে কিছু ছড়ি দিয়ে তাঁর দাঁতে আঘাত করতে থাকে বিদ্রুপের সুরে বলতে থাকে,আমি জানতাম, তুমি এমনই সুন্দর ছিলে। তখন আমি তাকে বললাম, কেমন কথা শোনাবো যা তোমাকে কষ্ট দিবে, তুমি যে জায়গায় আঘাত করছ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে বহুবার তাতে চুমু খেতে দেখেছি। একথা শোনার সাথে সাথে সে তার ছড়ি গুটিয়ে নেয়।যখন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারে মহিলাদেরকে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে আসা হয় সে তাদেরকে সবার থেকে আলাদা একটি ঘরে রাখার আদেশ দেয় এবং সরকারিভাবে তাদের খাবার দাবার এবং কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করে।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মদিনা প্রত্যাবর্তন :

কোন কোন বর্ণনা এসেছে, হুসাইনের হত্যার সংবাদ শোনার পর ইয়াজদ বলল,যদি আমি হুসাইনের মুখোমুখি হতাম আর আমার জীবনের একটি অংশ দিয়ে হলেও তার সাথে যুদ্ধে এড়িয়ে যেতে পারতাম তাহলে আমি তাই করতাম।

এরপর ইয়াজিদ ইবনে যিয়াদের কাছে এমন পত্র পাঠায় যেন, হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মহিলাদেরকে তার কাছে পাঠানো হয়।

তাদেরকে যখন ইয়াজিদের সামনে আনা হলো তখন হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে ফাতেমা, ইয়াজিদকে লক্ষ্য করে বলল -

হে ইয়াজিদ!রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়েরা বুঝি বাঁদিতে পরিণত হবে?

ইয়াজিদ বলল, না!তা কখনোই নয়, বরং তারা স্বাধীন ও সন্মানি হবে। তোমরা তোমাদের চাচাতো বোনদের অর্থাৎ ইয়াজিদের পরিবার, তাদের কাছে চলে যাও তারা তোমাদের সাথে সম্মানজনক আচরণই করবে। ফাতেমা বলেন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ইয়াজিদের বাড়ির সকল মহিলা আমাদের ধরে কান্না শুরু করে।

হোসাইন রাদিয়াল্লাহুর ছেলে আলি, যিনি অসুস্থতার কারণে কারবালার ময়দানে যুদ্ধে অংশ করতে পারেনি এবং শহীদ হননি,ইয়াজিদের কাছে পাঠানো হয়। ইয়াজিদ তাকে বলল, তোমার বাবা আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আমার প্রতি জুলুম করেছে। এখন দেখো! আল্লাহ তোমার বাবার সাথে কি আচরণ করেছেন।

তখন আলী জবাবে বলেন -

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

বাংলা অর্থ:পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যে কোনো বিপদই আপতিত হয়, তা আমি সৃষ্টি করার আগেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (সুরাহ হাদিদ -২২)

ইয়াজিদ তখন তার ছেলেকে জবাব দেয়ার জন্য বলে। কিন্তু সে জবাব দেওয়ার মতো কিছুই পেল না। তখন ইয়াজিদ বলল, তুমি এই আয়াত বলো -
ঠিক আছে, শুধু আয়াত আর অর্থ দিলাম:

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۝

অর্থ:
তোমাদের উপর যে বিপদই আসে, তা তোমাদের নিজ হাতের কামাইয়ের কারণেই। আর আল্লাহ অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।(সুরাহ - আশ শুরা)

ইয়াজিদ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের লোকদেরকে মদিনায় পাঠানো ব্যবস্থা করে এবং তাদের সঙ্গী হিসেবে বনি হাসেম এবং বনি আলীর হিতৈষী ও শুভার্থীদেরকে প্রেরণ করেন।তাদেরকে বলে দেয় এদেরকে পৌঁছে দেয়ার পর এরা যা যা চায় তাদেরকে তা দেওয়ার জন্য। তাদের কোন চাওয়া যেন অপূর্ণ রাখা না হয়। তাদের রওনা হওয়ার পূর্বেই ইয়াজিদ আলি বিন হুসাইনকে বললো, যদি তুমি আমার কাছে থাকো তাহলে আমি তোমার যথাযথ যত্ন নিব এবং তোমার জন্য সম্মানজনক আবাসনে ব্যবস্থা করে দিব। কিন্তু তিনি পরিবারের লোকদের সাথে যাওয়ারকেই বেছে নেন। যাওয়ার পূর্বে ইয়াজিদ আবারো আলির কাছে তার ওজন পেশ করে এবং ইবনে যিয়াদকে অভিশাপ করে এবং বলে যদি হুসাইন আমার কাছে কোন বিষয় চাইতো যা তার কাছে চেয়েছে তাহলে আমি তা অবশ্যই দিতাম। আমি তার জীবন রক্ষার জন্য সর্ব পন্থায় চেষ্টা করে যেতাম এমনকি যদি আমার কোন সন্তানকে এর কারণে হারানো লাগতো তাহলেও আমি তাই করতাম। কিন্তু আল্লাহ

যে ফয়সালা করেছেন তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তোমার যে কোন প্রয়োজনে আমার কাছে পত্র লিখবে।
ইয়াজীদ তাদের সাথে ৩০ জন লোক প্রেরণ করে এবং সিরিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি মুহরিজ বিন হুরাইস কালবি এবং বাহারার নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। এভাবে তাদেরকে সম্মান এবং মর্যাদার সাথে সিরিয়া থেকে মদিনার দিকে পাঠানো হয় ।

হুসাইন এর হত্যাকারীদের পরিণতি :

আল্লাহ তাআলা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে করুন পরিণতির স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া অত্যন্ত মন্দ পরিণতির শিকার হয়েছেন। তাদের কেউ নিরাপদে বাঁচতে পারেনি।

ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে ইব্রাহিম বিন আশতার হত্যা করে তার মাথা মোখতার সাকাফির নিকট পাঠিয়ে দেয়।

তার ইয়াজিদের পরিণতি ও ভালো হয়নি।হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করার কারণে অনেকেই তার বিপক্ষে চলে যায়। অনেক অঞ্চলে বিদ্রোহ তৈরি হয়। মদিনা বাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন হাররার নিষ্ঠুরই ট্রাজেডি সংঘটিত হয়। কিন্তু তারপর সে বেশিদিন বাঁচতে পারেনি। চার বছর শাসন করে সে মারা যায়।

যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিল, তাদের একজন প্রাণে বাঁচতে পারেনি। পৃথিবীতেই সবাইকে শাস্তি পেতে হয়েছে। কি হয়েছে হত্যার স্বীকার। কারো চেহারা হয়ে গেছে কালো।কারো বা হয়ে গেছে বিকৃত।কেউবা হারিয়েছে কর্তৃত্ব শ্বাসরক্ষমতা।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ভবিষ্যৎ বাণী :

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, একদিন জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসুল সাঃ এর নিকট ছিলেন। হুসাইন আমার কাছে ছিল।হঠাৎ সে কেঁদে উঠে। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিই। সে তার নানার কাছে যায়। জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বলেন ইয়া মুহাম্মদ! আপনি তাকে ভালবাসেন?

নবীজি বললেন, হ্যাঁ।
জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,আপনার উম্মত তো তাকে হত্যা করবে।আমি চাইলে সেই স্থানে মাটি আপনাকে দেখাতে পারি যেখানে তাকে শহীদ করা হবে। এরপর তিনি তাকে মাটি দেখালেন। উম্মে সালমা বলেন, করে দেখা গেল ঐ ভূমি হলো কারবালার ভূমি। জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন, বহু বছর পরে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর মুজেজা এবং তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ।

হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহে শাহাদাতের মূল লক্ষ্য :

আমরা যদি কারবালার পূর্ণ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো,হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের আত্মত্যাগের মূল লক্ষ্য ছিল -
১.কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা।
২.ইসলামের ইনসাফ পূর্ণ শাসন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।
৩.নববি পদ্ধতির খিলাফত এর পরিবর্তে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মোকাবেলায় অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যাওয়া।
৪.সত্যের বিপরীতে কোন পরাশক্তির সামনে মাথা নতনা করা
৫.ভীষণ বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া,মনবল ধরে রাখা।

৬.সবসময় আল্লাহর কাছে স্মরণ করা, তাঁরই উপর ভরসা করা।ভালো-মন্দ যাই ঘটুক তাতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

উপসংহার:

কারবালার প্রান্তরে জালেমরা যাদেরকে হত্যা করেছে, পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছে যাদের নাম -তাঁরা আজও অমর কেয়ামত পর্যন্ত অমর থাকবে। শত বছর চলে গেছে, এখনো তারা বেঁচে আছে কোটি মানুষের হৃদয়ে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকে মনে করেছে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, সত্য মিথ্যা দন্ডে সত্যই চিরন্তন বিজয় লাভ করে। যা কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত থেকে বুঝা যায় -

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ:
নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকিনদের জন্যই।(সুরাহ-হুদ-৪৯)

যারা ক্ষমতার ছড়িয়ে হাতে পেয়ে নেতৃত্বাসন গ্রহণ করে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, চালিয়ে যাই সীমাহীন জুলুম অত্যাচার, নেই কি মিটিয়ে ফেলতে চায়। এ ঘটনায় তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষার অপার উপকরণ।

সবশেষে মনে রাখতে হবে -সত্য মিথ্যা দ্বন্দ্বে কখনো যদি সত্যের আওয়াজ স্তিমিত হয়ে যায়,যদি সত্যপন্থীরা পরাজিত হয় কখনো, তবুও সত্য কখনো মিথ্যা হয়ে যায় না। মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা, যার বিনাশ অনিবার্য । সত্য চিরন্তন, তার কোন ক্ষয় নেই । কুরআনের ভাষায় বলা যায় -

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

অর্থ:
অতএব হে চক্ষুষ্মানগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।